আজকের নায়ক

শক্তিপদ রাজগুরু

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ—১৯৬৫

প্রকাশক ঃ

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ

বিভাস রায়

গৌরী প্রিন্টার্স

৬৫, বিধান সরণী

কলকাতা-৬

যদুপতিবাবু এই এলাকার অতি পরিচিত আপনজন। এলাকাটা কলকাতা মহানগরের লাগোয়া সহরতলী অঞ্চলই বলা যেতে পারে।

সহরের কেন্দ্র ডালহৌসী অঞ্চল থেকে দশ-পনেরো কিলোমিটার, তবু মনে হয় পাড়াগাঁই। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে গিয়ে উত্তরের কোন ষ্টেশনে নেমে খোয়াঢাকা রাস্তা চলে গেছে।

দুদিকে কিছু বাড়ি দোকান, তারপরই খোয়াঢাকা রাস্তার বদলে ইট পাতা সামান্য পথের রেখা। এদিক-ওদিকে ডোবা, বাঁশবন, ফাঁকে ফাঁকে দুচারটে পাকা, না হয় মেটে বাড়ি। তার ওদিকে ধানের জমি।

ধান, পাট, কিছু আনাজ পত্র হয়।

যদুবাবুর পৈত্রিক বাড়িটা ষ্টেশনের কাছেই। বনেদী পরিবার, এককালে সামান্য জমিদারী, জোত-জমিও ছিল। বাবা ছিলেন এই অঞ্চলের ডাক্তার।

অর্থ রোজগারও যেমন করতেন, সুনামও তাঁর ছিল তেমনি, হৃদয়বান মানুষ।

তার ছেলেরা সকলেই কৃতি। দুই ছেলে ডাক্তার, একজন এঞ্জিনিয়ার। তারা কেউ দিল্লী, কেউ বোম্বাই, একজন নাগপুরেই রয়েছে। সেখানেই তারা প্রতিষ্ঠিত।

ছোট ছেলে যদুপতি এম-এ পাশ করে কলকাতার কোন কলেজে অধ্যাপনা করে। সেই-ই রয়ে গেছে এই বাড়িতে। যদুপতি তখন দেশসেবার আদর্শে মেতে উঠেছে। মা আগেই মারা যান, বাবাও চলে গেলেন তার কয়েক বছর পর।

যদুপতি তখন ওই এলাকার মানুষদের শিক্ষা, চিকিৎসা এইসব

সমস্যা সমাধানের চিন্তায় ব্যস্ত। তার জন্য নিজের জমি, টাকাও দিয়েছে। এইসব কাজের জন্য নিজে ঘর সংসার করার কথা ভাবার সময়ও পায় না।

তাই বিয়ে করাও হয় নি।

দেবেনবাবুকে ওই যদুপতিবাবুই এনেছিলেন এই এলাকায় তাঁর নিজের কাজে হাত লাগাবার জন্য।

তখন এই এলাকায় মানুষের বসতি ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিছু সাধারণ মানুষের বাসও ছিল। কলকাতা না হয় আশে-পাশের পাটকলে, কারখানায় চাকরী করতো, আর বেশির ভাগ মানুষ ছিল কৃষিনির্ভর। এদিকের জমিতে নানারকম আনাজপত্র ধান, পাটও ভালোই হয়। কাছেই সহর কলকাতা, ট্রেনে করে শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে কোলে মার্কেটে ভালোই ব্যবসা করতো তারা।

কিন্তু শিক্ষার কোন পরিবেশ তেমন ছিল না। বাঁশবনের ধারে বেশ খানিকটা এলাকায় ছিল খেলার মাঠ। গ্রামের ছেলেরা সেখানে বাঁশের খুঁটি পুতে গোলপোষ্ট বানিয়ে ফুটবল খেলতো।

ওরই ওদিকে খানিকটা খোলামেলা জায়গার একদিকে টালির ছাওয়া মাটির প্রাচীরঘেরা লম্বা ঘর কয়েকটা দাঁড়িয়ে ছিল। দরজা জানলাও তেমন ছিল না। কয়েকটা ভাঙ্গা বেঞ্চ, নড়বড়ে চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ডও সব ঘরে ছিল না। এইটা ছিল মাইনর স্কুল।

ছাত্ররাও আসতো খেয়াল খুশীমত। মাষ্টার দু-চারজন নামেই ছিল।

যদুপতিবাবু সেবার এই স্কুলের উন্নতির জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। আর হাতের কাছে পেয়ে গেলেন দেবেনবাবুকে।

ট্রেনেই আলাপ। বারাসত ছাড়িয়ে কোন অজগাঁয়ে বাড়ি। কলেজের পড়া শেষ করে কলকাতা যাতায়াত করছেন দেবেনবাবু চাকরীর সন্ধানে।

যদুপতিবাবু তখনও কলেজের অধ্যাপনা করছেন। তাঁকেও ট্রেনে যাতায়ত করতে হয়। তিনিই দেবেনবাবুর মুখে তাঁর চাকরী খোঁজার কথা শুনে বলেন—চাকরী নয়, যদি কিছু করতে চান, আপনাকে কাজ দিতে পারি। মাইনে নয়—সামান্য সম্মান দক্ষিণাই পাবেন এখন। তারপর স্কুল যদি দাঁড়ায় তখন অবস্থার উন্নতি হবে। তবে এখন সেসব আশা করবেন না। সেটা নির্ভর করছে আপনার কাজের উপর।

দেবেনবাবুও তখন তরুণ। সংসারের বোঝাও চাপেনি তাঁর ঘাড়ে। যদুবাবুকে তাঁরও ভালো লাগে। তাই দেবেনবাবু রাজী হয়ে যান।

আর এসে পড়েন এই এলাকায়। যদুবাবুদের ওদিকের একটা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

দেবেনবাবুকে চিনতে ভুল করেননি যদুবাবু। দেবেনবাবু এই সবুজ পরিবেশে এসে ওই স্কুলটাকে ভালবেসে ফেলেন।

তাঁর নিজের মধ্যেই লুকিয়েছিল একজন নিঃস্বার্থ সমাজসেবী, মানবপ্রেমিক শিক্ষাব্রতী। তাঁর নিষ্ঠা আর একান্ত চেষ্টায় দেবেনবাবু যদুবাবুর আশাকে ফলবতী করে তুলতে পারবেন সেই বিশ্বাস হয় যদুবাবুরও।

—কি মাষ্টার, স্কুল চলছে কেমন ?

যদুবাবুও মাঝে মাঝে স্কুলে আসেন।

ক'মাসেই ওই ধ্বসেপড়া স্কুল বাড়িটাকে মেরামত রং চং করে তুলেছেন দেবেনবাবু। ভাঙ্গা চেয়ার বেঞ্চগুলোও মেরামত করিয়েছেন বাজার এলাকায় কোন আড়তদারকে ধরে।

ছেলেদের উপস্থিতিও বেড়েছে।

সামনের মাঠটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে স্কুলের ছেলেদের নিয়ে সুন্দর বাগানও করিয়েছেন।

গ্রাম—আশপাশের এলাকার মানুষদের বাড়ি বাড়ি যান দেবেনবাবু, গ্রামবাসীদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে বলেন।

তাদের কাছ থেকে সাহায্যও পান।

আর দেবেনবাবু তাঁর সহকারী কয়েকজন শিক্ষকদের নিয়ে পড়াশোনার কাজেও মন দেন। দেবেনবাবু বলেন তাঁর অন্য শিক্ষকদের– দু চারটে ছেলের রেজাল্ট ভালো করাতেই হবে। যারা ভালো ছেলে তাদের পড়াশোনায় চাপ দিন, ক্লাশের সব ছেলে যাতে পড়াশোনা করে সেটাও দেখুন।

এতদিন পর এবার এই স্কুলের বেশ কয়েকজন ছাত্র ভালো রেজাল্ট করে পাশ করে বারাসতের সরকারী হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে যায়।

আর এই অঞ্চলে ক্রমশঃ এই স্কুলের নাম ছড়িয়ে পড়ে!

দেবেনবাবু বলেন সেবার কমিটি মিটিংএর সময় যদুবাবু এবং উপস্থিত অভিভাবকদের—আমাদের স্কুলেই এবার বছর বছর একটা করে ক্লাশ বাড়াতে হবে! যাতে এখানের ছেলেরা এই স্কুল থেকেই স্কুল ফাইন্যাল দেবার সুযোগ পায়। আর আপনাদের সাহায্য, সহযোগিতা পেলে সেটা করা অসম্ভব নয়।

যদুবাবুও তাই চান। তাই চান এখানের কমিটি মেম্বাররা, অভিভাবকরাও। তাঁরাও শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করছেন।

তাঁরাই বলেন—আমরা সবরকম সাহায্য করবো। এখানের স্কুলই বড় হোক। আপনার সঙ্গে আমরা আছি মাষ্টারমশায়।

দেবেনবাবু বলেন—স্কুল বাড়ি বাড়াতে হবে। ক্লাশরুম, লেবরেটারী, একটা হল, আর বেঞ্চ, চেয়ার এসব করতে হবে। লাইব্রেরী গড়তে হবে। তার জন্য টাকা চাই। একসঙ্গে না হলেও চলবে। তবে বছর বছর বাড়াবার জন্য টাকা চাই। আরও শিক্ষক চাই—সেদিন সকলেই মুক্ত কণ্ঠে সহযোগিতার আশ্বাস

দিয়েছিলেন। দেবেনবাবুও তাঁর সব উদ্যম দিয়েছিলেন স্কুলের পিছনেই।

যদুবাবু অবশ্য সাহায্য করেছিলেন, আর বাকীট সবই গড়ে উঠেছিল দেবেনবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে।

দেবেনবাবু এইসময় বিয়ে থা করে সংসারী হন। এই বিয়েটাও ঘটেছিল একটা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে।

এই স্কুলের সেকেণ্ড টিচার ধরণীবাবু ছাপোষা শিক্ষক। তখন শিক্ষকদের মাইনেও তেমন কিছু ছিল না, তায় প্রাইভেট স্কুল। কোনরকমে সামান্য কিছু পেতেন শিক্ষকরা। ধরণীবাবুর মেয়ের বিয়ে। কোনমতে কিছু টাকার যোগাড় করেছেন বৃদ্ধ শিক্ষক জমি বিক্রী করে। পাত্র কোন জুটমিলে কাজ করে।

বিয়ের আসরেই পাত্রের বাবা বরপণের পুরো তিন হাজার টাকা না পেলে পাত্রকে ছাতনাতলায় যেতে দেবে না। ধরণীবাবু শেষ জমিটুকু বিক্রী করে মাত্র হাজার দুয়েক টাকা পেয়েছেন।

তার থেকে বিয়ের অন্য ঘটা হয়েছে। রয়েছে মাত্র হাজার দেড়েক, বাকী টাকার যোগাড় হয় নি। কাতর কণ্ঠে ধরণীবাবু বলেন পাত্রপক্ষকে—আমি বাকী টাকা এক মাসের মধ্যেই মিটিয়ে দেব। এ যাত্রা গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার করুন। আমি কথা দিচ্ছি।

কিন্তু পাত্রপক্ষ অচল, অটল। তারা জানায়—সব টাকা এখুনিই চাই, না হলে পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এমন জোচ্চোরের মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দেবে না।

ধরণীবাবুর, উপস্থিত গ্রামবাসীদের কোন অনুরোধ না শুনে পাত্রের বাবা পাত্র ও বরযাত্রী উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

কি হবে!

দেবেনবাবুও এ বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গেছিলেন। যদুবাবুও এসে পড়েন। ধরণীবাবুর বাড়িতে তখন কান্নাকাটি উঠেছে। কনে লগ্নভ্রষ্টা হলে আর তার বিয়েও হবে না।

এদিকে ধরণীবাবুর টাকাও নাই। বিজয়াও দেখছে সব। কনের সাজে বসেছিল, হঠাৎ শোনে এ বিয়ে হবে না। মা কাঁদছে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ধরণীবাবু পাগলের মত কপাল চাপড়াচ্ছেন আর হাহাকার করছেন। এই রকম সর্বনাশের আঘাতে তিনি যেন পাগলই হয়ে যাবেন।

দেবেনবাবু সব ঘটনাটাই দেখেছেন। বিনাদোষে একটা মেয়ের চরম সর্বনাশ হবে এটা ভেবেই তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করে নেন। সমবেত জনতাও হতভম্ব হয়ে গেছে। এমন সময় দেবেনবাবু বলেন—মাষ্টারমশায়, আপনার আপত্তি না থাকলে আমিই আপনাকে এই বিপদে সাহায্য করতে পারি! আমি বিয়ে করবো ওই মেয়েকে—ধরণী মাষ্টার যেন এটা ভাবতেই পারছেন না। পাত্র হিসাবে দেবেন ওই পাটকল কর্মীর থেকে বহুগুণে সুপাত্র। শিক্ষিত, আর বড়ঘরের ছেলে।

যদুপতি অবাক হন—বলকি মাষ্টার! তুমি আজ এই বৃদ্ধ মানুষটাকে, তার পরিবারকে বাঁচালে, এই এলাকার মুখ রাখলে মাষ্টার। ধরণীবাবু, তাহলে আর দেরী করবেন না। এই লগ্নেই বিয়ে হবে। ওই পাটকলের বাচ্চাও দেখে যাক—এখানে মানুষের অভাব নেই। মানুষ এখানে এখনও আছে।

সারা অঞ্চলে দেবেনবাবুর এই মহানুভবতার কথা ছড়িয়ে পড়ে। সমারোহ করে বিয়ে হয়ে গেল। বিজয়া এল দেবেনবাবুর শূন্য ঘরে।

দেবেনবাবুর স্কুল সেবারেই ক্লাশ টেন অবধি সরকারী স্যাংশন পায়। আর এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় এই স্কুলের ছাত্র জেলার মধ্যে প্রথম হয়। বারজন ষ্টার মার্কস পায়।

স্কুলের নাম, সেই সঙ্গে সারা এলাকায় শিক্ষক হিসাবে দেবেন-বাবুর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এই স্কুলে ছেলেদের ভর্তি করাবার জন্য ভিড় শুরু হয়।

বিজয়া এসেছে তার নতুন সংসারে। স্কুলের ওদিকে এখন দেবেনবাবুকে যদুপতিবাবু কিছুটা জায়গা দিয়েছিলেন যৌতুক হিসাবেই। সেখানে ছোট্ট একটা বাড়িও করেছেন দেবেনবাবু। বিজয়ার হাতের ছোঁয়ায় সেই শূন্যঘর আজ পূর্ণ হয়েছে। বিজয়াকে বলেন দেবেনবাবু—তোমার জন্য এই সব হয়েছে সাবিত্রী। অভাগার ঘর হয়েছে, স্কুলেরও নাম ডাক হয়েছে।

বিজয়া বলে—ওইতো আমার সতীন!

অবাক হন দেবেনবাবু—সতীন! সতীন কে গো তোমার?

শোনায় অভিমান ভরে বিজয়া—ওই স্কুল। ওই তো তোমার ধ্যান, জ্ঞান। সংসারের দিকে মন আছে না আমার দিকে। দিনরাত ওই স্কুল আর ইস্কুল! সতীন নয়তো কি?

হাসেন দেবেনবাবু,—তা কি করি বল। তুমি আসার আগেই যে ওই ইস্কুল এসে গেল আমার জীবনে। ওকে ফেলি কি করে?

বিজয়া বলে,—হাত মুখ ধুয়ে নাও। চা খাবার দিই। সেই কখন বের হয়েছো!

দেবেনবাবু সকালেই স্কুলের ডোনেশনের জন্য নিমতা বাজারের আড়তদার নন্দবাবুর ওখানে গেছিলেন। কিছু টাকা পেলে সায়েন্স ল্যাবরেটারীটাকে সাজাতে পারবেন। দিনভোর চা ছাড়া আর কিছু জোটেনি। স্কুল সেরে বাড়ি ফিরে এবার খিদেটা টের পান।

বলেন দেবেনবাবু—হ্যাঁ। খিদেও লেগেছে।

বিজয়া বলে—ইস্কুলের চিন্তায় খিদে তেষ্টাও ভুলে যাও তা জানি!

যদুপতিবাবু একদিকে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ইস্কুলের জন্য যোগ্যতম লোককেই পেয়েছেন তিনি। সেই মাটির ধ্বসে পড়া মাইনর স্কুল এখন পাকা দোতলা নামী হাইস্কুলে পরিণত করেছে ওই একটি মানুষ।

এবার উঠে পড়ে লেগেছেন দেবেনবাবু স্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের পর্যায়ে নিয়ে যেতে।

যদুপতিবাবু দেখেছেন দিন বদলাচ্ছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে এসেছে আর এক কঠিন সমস্যা।

স্বাধীনতার আনন্দকে বিষাদে পরিণত করেছে। দেশের সামনে এসেছে বিরাট এক সমস্যা। দেশ বিভাগের পর ক্রমশঃ ওদেশ থেকে বিরাট একটা জনস্রোত ধেয়ে আসছে। ছিন্নমূল লাখো মানুষ সব হারিয়ে বানে ভাসা খড়কুটোর মত এদেশের ঘাটে ঘাটে এসে জমেছে।

যদুপতিবাবু দেখছেন সেই লাখ লাখ মানুষ এসে ভিড় করেছে সহরতলীর আশেপাশেও। শিয়ালদহ, হাওড়া ষ্টেশন চত্বর ভরে গেছে তাদের ভিড়ে।

একদিন কলকাতা থেকে ফেরার পথে দেখলেন ওই ভিড়ের একদিকে একটা ছেলে বসে আছে। চোখমুখ শুকনো, পরণের জামাপ্যাণ্টও ময়লা, ছেঁড়া। ওইটাই বোধহয় তার একমাত্র পরিধেয়।

ছেলেটা কি ভেবে যদুপতির দিকে এগিয়ে এসে দেখছে ওঁকে কাতর চাহনি মেলে। ভিক্ষে চাওয়ার অভ্যাস যে ওর নেই তা বোঝা যায়।

যদুপতিবাবুই শুধান—কি রে, কিছু বলবি?

ছেলেটা কিছু বলতে চেষ্টা করে, পারে না। হঠাৎ আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

যদুপতিবাবু দেখছেন ওকে। বলেন—কাঁদিস না! কে কে আছে তোর?

ছেলেটা কান্নাভিজে স্বরে বলে—কেউ নাই। বাপ মা ভাই সবাইকে ওরা মারছে। ঘরবাড়ি সব জ্বালাই দিছে। আমি রাতের অন্ধকারে বনে পালাই বাঁচছি। বাবু—কেউ নাই আমার। এগোর সঙ্গে হাঁইটা—টেরেনে শিয়ালদায় আইয়া পড়ছি। দু দিন খাতি পাই নাই—ছেলেটা ওর জীবনের করুণ কাহিনীটা কোনমতে ব্যক্ত করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

যদুপতি দেখছেন ছেলেটাকে। বড়জোর দশ বারো বছর ওর বয়স। এই বয়সেই জীবনের নিষ্ঠুরতম আঘাতই পেয়েছে সে। জীবন, এই সমাজ তাকে কিছুই দেয় নি, সবকিছু নিষ্ঠুর দৈত্যের মত ছিনিয়ে নিয়েছে ওর।

যদুপতি শুধোন—এখানে কোথায় থাকিস?

ছেলেটা বলে—এদিকে ওদিকে পইড়া থাকি।

একেবারেই অনাথ। অসহায় ছেলেটা। পায়ের তলে মাটি-টুকুও নেই। মাথার উপর কোন আশ্রয় নেই। নেই কোন আপনজন।

যদুপতি বলেন—আমার ওখানে থাকবি। ছেলেটাও রাজী হয়ে যায়। তবু বাঁচার আশ্রয়—দুমুঠো অন্ন পাবে। যদুবাবু শুধোন।

—তোর নাম কি?

—রমেশ! রমেশ চন্দ্র সরকার। সাং কীর্তন ঘোলা, পোঃ শীজলকাঠি, জেলা ফরিদপুর।

অর্থাৎ ছেলেটা বেশ বুদ্ধিমান, চালাক চতুর, আর পড়াশোনাও করত ওখানে। না হলে এভাবে হাল সাকিন সব বলতে পারতো না।

যদুবাবু বলেন—এবার ওসব ঠিকানা ভুলে যা।

নতুন ঠিকানাটা জেনে নিবি পরে রমেশ।

রমেশকে নিয়ে আসেন যদুবাবু তাঁর বাড়িতে।

যদুবাবুর বড় বাড়িটায় থাকার জায়গার অভাব নেই। পুরোনো আমলের বাড়ি, ওদিকে কিছু বাগান, একটা পুকুরও আছে।

আর যদুবাবুর ওখানে দু চার লোক, দলের কর্মী আসে, থাকে। পুরোনো চাকর গোবিন্দের এনিয়ে অনুযোগের অন্ত নেই।

তবু তারা থাকে, রমেশ নামের ওই ছেলেটাও এসে জুটলো। গোবিন্দ বলে।

—বাবুর সম্পত্তি ভূতেই খাবে, এলেন আর এক পোষ্যপুত্র। থাক—

রমেশ রয়ে গেল।

যদুবাবু ক্রমশঃ ছেলেটাকে চিনতে পারেন।

রমেশ ছেলেটা এমনিতে শান্ত। ও জানে দুনিয়ায় তার কেউই নাই, কারো উপর কোন দাবী জানাবার অধিকার তার নেই।

তাই যা পায়, যেটুকু পায় তাই নিয়েই তৃপ্ত থাকার চেষ্টা করে। সে দেখেছে যদুপতিবাবুকে।

এ বাড়ির কর্তা তিনি। কিন্তু কর্তৃত্ব করে ওই গোবিন্দদাই। রমেশ এবার গবুদারই ভক্ত হয়ে পড়ে। তার হাতের কাজ টেনে নিয়ে নিজেই করে দেয়। যদুবাবুর চা এর দরকার যখন তখন। লোকজন আসছে। রমেশই এর মধ্যে চা করতে শিখে গেছে। সেইই বলে—তোমাকে দৌড় ঝাঁপ করতে হবে না গবুদা, আমিই চা দিচ্ছি।

গবুর হিসাব কিতাব মাথায় ঢোকেনা।

যদুবাবু পয়সা দিয়ে খালাস। সংসার চালাতে হয় গোবিন্দকে হিসাব করে। রমেশ আর গোবিন্দ নিজের জীবনের হিসাব মিলাতে পারে নি। সংসারের হিসাব মেলাবে কেমন করে?

তাই সব গোলমাল হয়ে যায়। বকুনি খায় যদুবাবুর কাছে।

রমেশ এবার গোবিন্দের হিসাব পত্র খাতায় লিখে রাখে নিখুঁত ভাবে। হপ্তাহের টাকার জমা খরচ সব গুছিয়ে লেখে। গবুও খুশী।

বাঃ দারুণ বুদ্ধিতো তোর?

রমেশ বলে—অঙ্ক স্কুলে ফার্স্ট হতাম। ইংরাজি, বাংলা, ইতিহাসেও সব চেয়ে বেশী নম্বর পেতাম।

যদুবাবুও দেখেছেন গবুর হিসাবের খাতাটা। সুন্দর হাতের লেখা, আর নির্ভুল হিসাব রেখেছে রমেশ।

গবু বলে—ছেলেটার খুব মাথা গো। আর বেশ ভালো ছেলে।

যদুবাবু দেখেছেন রমেশকে। ফাই ফরমাস খাটে নিপুণ ভাবে। আর হাসিটুকু লেগেই থাকে।

সেদিন যদুবাবু ওকে বলেন।

—স্কুলে পড়তে যাবি। পড়াশুনা করবি—আর বাকী সময় গবুদার হিসাব রাখবি। কিরে, পড়বি? ইস্কুলে।

রমেশ এখানে এসে এর মধ্যে জায়গাটাকে ঘুরে ঘুরে দেখেছে। আধা শহর, আধা গাঁ। পিচ রাস্তা কিছু আছে। বাকী এখন খোয়া বেশী, না হয় কাঁচা রাস্তাই।

তবে স্টেশনের আশপাশে বড় বড় বাড়ি—সাজানো দোকান, সিনেমা হাউস এসব আছে।

একটু ভিতরে স্কুল বাড়ী—খেলার মাঠও দেখেছে। দেখেছে স্কুলে ছেলেদের ভিড়। কত ছেলে পড়তে যাচ্ছে। বিরাট এলাকা জুড়ে বাড়িটা, গেটে স্কুলের নাম লেখা রয়েছে।

কিন্তু ভিতরে যাবার অধিকার রমেশের নেই। গেটটা বন্ধ। ক্লাস চলছে। তাদের গ্রামের স্কুলের থেকে অনেক বড় এই স্কুল।

রমেশের খুব ইচ্ছা হয় সেও এই স্কুলে পড়বে এই ছেলেদের মত। কিন্তু বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাসই বের হয়। তার এত বড় দুনিয়ায় কেউ নাই, কিছুই নাই। বাঁচার অধিকার তার নেই। এদের দয়ায় কোনমতে একটু আশ্রয় পেয়েছে মাত্র। ফিরে আসে পায়ে পায়ে রমেশ।

আজ যদুবাবুকে এই স্কুলে পড়ার কথা বলতে রমেশ খুশীই হয়। বলে সে।

—গাঁয়ের স্কুলে ক্লাস ফোরের থেকে ক্লাস ফাইভে উঠেছিলাম ফার্স্ট হয়ে। তারপর এসব পাট চুকে গেছে গিয়া।

যদুবাবু বলে—আবার পড়বি মন দিয়ে।

—কিন্তু বই-খাতা, মাইনে—তারপর জামা-কাপড় জুতো এসব তো অনেক ঘটা—

ওর কথায় হাসেন যদুবাবু। ছেলেটা হিসাবীই।

যদুবাবু বলেন

—ওর জন্য তোকে ভাবতে হবে না। ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কাল, তুই আমার সঙ্গে স্কুলে যাবি দশটার পর।

রমেশ যেন স্বপ্ন দেখছে।

সেই বন্ধ গেটটা যদুবাবুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে খুলে দেয়। দ্বারোয়ান সশ্রদ্ধ নমস্কার করে। দেখছে রমেশ। এখানেও সকলে যদুবাবুকে সম্মান করে।

অবশ্য রমেশ এর আগেও যদুবাবুর সঙ্গে পথে-ঘাটে বাজারেও বের হয়েছে।

দেখেছে এই এলাকার সব মানুষ, দোকানদার এই লোকটিকে চেনে, শ্রদ্ধা করে। মায় রিক্সাওয়ালারাও যারা কাউকে মান খাতির করে না, তারাও সমীহ করে কথা বলে।

স্কুলের টানা বারান্দা দিয়ে চলেছেন যদুবাবু, দুদিকে তখন ক্লাস শুরু হয়েছে। পড়ার শব্দ। কোন ক্লাসে মাষ্টার মশাই পড়াচ্ছেন, রমেশ দুর-দুর বুকে যদুবাবুর সঙ্গে এসে হেডমাষ্টার মশায়ের ঘরে ঢুকলো।

দেবেনবাবু তখন অফিসের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ যদুবাবুকে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

…আপনি ; বসুন বসুন ;

যদুবাবু সঙ্গের ছেলেটিকে দেখিয়ে বলেন।

—এর নাম রমেশ।

রমেশও বুঝেছে ইনিই হেডস্যার। রমেশ ওঁকে প্রণাম করে, যদুবাবুকেও।

দেবেনবাবুও দেখেন ব্যাপারটা! বলেন দেবেনবাবু

—একেই এনে আশ্রয় দিয়েছেন তাহলে।

যদুবাবু বলেন—জুটে গেল। ছেলেটি ওখানে ক্লাস ফাইভে উঠেছিল বলছে। অবশ্য কতদিন পড়াব সুযোগ ও পাই নি। একে স্কুলে ভর্ত্তি করে নাও মাষ্টার। ছেলেটা খুব বুদ্ধিমান। যদি পড়াশোনা করে নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে পারে একজনের সমস্যার সমাধান হবে।

দেবেনবাবু দেখছেন রমেশকে। বলেন,

—ঠিক আছে. ওকে একটু পরীক্ষা করে নিয়ে ভর্তি করবো। কাল ওকে পাঠিয়ে দেবেন।

রমেশ এই বয়েসই বহু দুঃখ-কষ্টের মুখোমুটি হয়েছে, জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সে জানে তাকে নিজের চেষ্টাতেই বড় হতে হবে। যে ভাবে হোক তার অধিকার কায়েম করতেই হবে।

আর ও এও বুঝেছে টাকাটাই দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় কথা। সেই টাকা তাকে অনেক রোজগার করতে হবে।

তাই তার জন্য তৈরী হতে হবে তাকে।

এর মধ্যে রমেশ পাশের বাড়ির কালিপদর কাছ থেকে তার পুরানো বই পত্র কিছু যোগাড় করে পড়ছে। হাতের লেখাটাও তার ভালো।

তাই সেদিন পরীক্ষায় ভালোভাবেই উত্তরগুলো দিতে পারে রমেশ। ইংরাজীও ভালোই জানতো, অংকও, সেগুলো ভেবেছিল ভুলে গেছে। কিন্তু কয়েকদিন পড়ার ফলে আবার সব স্মরণে আসে।

তাই পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করে সে ক্লাশ সিক্স-এ ভর্তি হয়ে যায়।

যদুপতিবাবুও এতটা আশা করেন নি।

তিনিই হেডমাষ্টারকে বলেন—ছেলেটার পড়াশোনায় মাথা আছে দেখছি।

দেবেনবাবু বলেন—তাই দেখছি, ইংরাজী ত ভালোই জানে। দেখুন কেমন পড়াশোনা করে।

রমেশ পড়াশোনাতেও মন দেয়। জানে সে তাকে জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এই তার একমাত্র সুযোগ।

যদুবাবুও ওর পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। বইখাতা—পোষাক এসবও জুটে যায়।

আর রমেশকেও নিঃসন্তান এই যদুবাবু যেন নিজের ছেলের মতই দেখেন। যদুবাবু পুরোনো চাকর গোবিন্দকে বলেন—ছেলেটা পড়াশোনা করছে, ওকে একটু দুধমাছ এসব খেতে দিস।

গবু বলে– হ্যাঁ, এমনতো অনেককে খাওয়ালে পরালে বাবু, তোমাকে কেউ দেখলো ? কত ছেলে তো পাশ করে চলে গেলো, শুনি কেউ কেটা হইছে। একবার, খবর নেয় তোমার ? আবার একটাকে জুটিয়েছো।

হাসেন যদুপতিবাবু —আগের যুগের ঋণ শোধ করছি, কত যে ঋণ করেছিলাম জানি না।

গোবিন্দ বলে—কোন্ কথার কোন্ জবাব। বিলোও তোমার টাকা, বিলোও। তবে বলছি যাদের পুষছো, মানুষ করছো—তারা কোনদিন দেখবে না তোমাকে, দুনিয়া বেইমানের ভিড়ে ভরে গেছে।

যদুবাবু জবাব দিলেন না।

ক'বছরেই অনেক পরিবর্তন ঘটে যায় এই শান্ত জনপদের বুকে।

ওদিক থেকে মানুষের ঢল এসে নেমেছে।

দেশবিভাগ যে আমাদের বুকে কত গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তা বাইরে থেকে সবটা দেখা না গেলেও যদুবাবুর মত সমাজসেবী মানুষদের কাছে সেটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ, মন্বন্তর-দাঙ্গা, আর দেশবিভাগ।

এই কটা ধাক্কাই বাঙালীর জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আর ওই লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল হয়ে এসে শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদেই যে যেখানে পেরেছে জলা-বন-কাশবন, হোগলাবন, সহরের উপকণ্ঠ সেখানেই বসত গড়েছে। জবর দখল করার অধিকার যেন তাদের জন্ম গেছে। আর বাঁচার জন্য যা কিছু দরকার তাই করতে বাধ্য হয়েছে।

এই যা কিছু করার মনোবৃত্তিটাই এনেছে সমাজের বুকে একটা প্রচণ্ড ভাঙ্গনের আঘাত। এই আঘাতই সমাজের শালীনতা মূল্যবোধ সবকিছুর মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে।

ক্রমশঃ এই পাবার জন্য সমাজের একটা বৃহত্তর শ্রেণী সব কিছু করার জন্য যেন ছাড়পত্র আদায় করে সমাজের বুকে কায়েম হয়েছে।

আইন নাই কোন কিছুর জন্য সাধনা নেই, নিষ্ঠা নাই। পেতে হবে। আর কিছু স্বার্থপর মানুষ ত এদের নিয়ে পাবার রাজনীতিতেও পা বাড়াতে শুরু করেছে। ওদের ওই সর্বহারাদের পাইয়ে দেবার সমর্থনে নিজেই পাবার পথ করেছে।

এই শান্তজনপদ এখন জনসমাকীর্ণ শহরতলীতেই পরিণত হয়েছে। বাজার এর আশপাশ ছাড়িয়ে ওদিকে ধানমাঠ—বাঁশবন, জলাভূমি বুজিয়ে গড়ে উঠেছে বাড়িঘর। ওই জনপদের বিস্তৃতি চলে গেছে বহুদূর অবধি।

পথেঘাটে শুধু মানুষের ভিড়।

পথের দুদিকে জবর দখল করা জায়গায় দোকান, গুমটি দোকান। আর পথ জুড়ে সারিবন্দি রিক্সার ভিড়।

ষ্টেশন বাজারে পা ফেলার জায়গা নেই। এসেছে লাখ লাখ মানুষ ওদিক থেকে। তারা এখানের আগেকার জীবনের ছন্দকে তছনছ করে এক জগাখিচুড়ি পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

ফলে এখানের শান্ত জীবনছন্দেও এসেছে একটা বিরাট পরিবর্তন।

যদুপতিবাবু দেখছেন এই পরিবর্তনকে। তার এতদিনের স্বপ্ন আজ যেন হারিয়ে গেছে। এই নতুন সমাজ মানুষকে মান-সম্মান দিতে জানে না। সব আদর্শ, মূল্যবোধ বাঁচার তাগিদে আজ যেন অর্থহীন হয়ে যেতে বসেছে।

দেশ বিভাগের সর্বনাশা ফল বাঙ্গালীর জীবনে যে বিপর্যয় আনছে তার সুরু হয়েছে এই ভাবেই, এই বিষবৃক্ষে কি ফল ফলবে তা জানেন না যদুবাবু।

স্কুলের ছাত্রসংখ্যাও হু হু করে বাড়ছে। এত ছেলেকে ঠাঁই দিতে হবে। স্কুল কমিটির মিটিং এ দেবেনবাবু কথাটা তোলেন।

—স্কুলের বিল্ডিং করতে হবে আরও।

যদুপতিবাবুও সায় দেন। আর নিজেই তদ্বির তদারক করে সরকার থেকে বেশ কিছু টাকা আনেন, বাকী টাকা যোগাড় করার জন্য স্থানীয় মানুষদের কাছেই হাত পাতেন। আর সেই টাকাও আসতে থাকে।

নতুন বিল্ডিং-এর জন্য কয়েক লক্ষ টাকা এসে যেতে দেবেনবাবু এবার প্ল্যান করিয়ে কমিটির সামনে পেশ করেন।

এখন নিউ বসন্তপুরে এসেছে হাজার হাজার মানুষ, বাড়িঘর করে তারা এখানের সমাজে ঢুকেছে। কমিটিতেও ঢুকেছে তাদের অনেকে।

বসন্তবাবুও সেই নবাগতদের একজন। এখানে এসে অনেকের বাড়ি তৈরীর কাজে সাহায্য করেছেন। আর বাজারের ওদিকে বেশ কিছুটা বাঁশবন কিভাবে দখল করে সেই বাঁশবন কেটে সেখানে ইট-বালি-চুন সিমেণ্টের দোকান করেছেন।

বসন্তবাবু এমনিতে বেশ হিসাবী লোক।

রাস্তার ওদিকে বিরাট জায়গা জুড়ে আগে থেকেই একটা পাটের গুদাম, জুট প্রেস ছিল। তখন এদিকে জায়গার দামও তেমন ছিল না। চারিদিকে প্রচুর পাট হতো।

তাই সরসী আগরওয়ালা এদিকে বিশাল গুদাম করে ওই সব

পাট দাদন দিয়ে সস্তায় কিনে গুদামজাত করে সেই পাটকে গাঁট বেঁধে বহু পাটকলে চড়া দামে সাপ্লাই করতো।

সরসী আগরওয়াল মারা যেতে তার ছেলে ভানু আগরওয়াল সেই ব্যবসা চালায় কিছুদিন, বিশাল পাঁচীল ঘেরা জায়গাটার একদিকে গুদাম, শেড, কারখানা।

অন্যদিকে আগরওয়ালাজী বেশ সুন্দর একটা বাংলো করেছিল, সামনে ঘাট বাঁধানো পুকুর। কলকাতার বড়বাজারের ঘিঞ্জী থেকে দু-পাঁচ দিন এই নির্জন সবুজে এসে থাকতেন তিনি।

মিঃ আগরওয়াল মারা যেতে তার ছেলে ভানু আগরওয়ালা কিছুদিন এই জুট প্রেস চালায়।

কিন্তু ততদিনে এইসব বিস্তীর্ণ জমির চারগুণ দাম পেতে গরীব চাষীরা টাকার লোভে জমি বিক্রী করে দিল। পাটচাষও বন্ধ হয়ে আসতে ভানু আগরওয়াল জুট প্রেস বন্ধ করে দিল।

বিরাট পাঁচীল ঘেরা বাগানের একদিকে পড়ে রইল গুদাম, শেড। অন্যদিকে বাংলোটায় মাঝে মাঝে আসে ভানু আগরওয়াল, ওখানে রাতে আলো জ্বলে, মদের আসর, মধুচক্রও বসে শোনা যায়।

ভানু আগরওয়ালের অবশ্য অন্য ব্যবসা-পত্র আছে, তাই এসব জুটতে অসুবিধা হয় না।

এই রাস্তার ওদিকে কলকাতার আর এক রহিস আদমী মিঃ সেনের বিরাট বাগান বাড়িটা গড়ে উঠেছিল আগেই।

যদুপতিবাবুর পরিচিত মিঃ সেনের কলকাতায় বড় ব্যবসা। তিনিও কলকাতা ছেড়ে নির্জন সবুজে দু চার দিন বাস করার জন্য এই বাগান বাড়িটা করেছিলেন।

মিঃ সেন মাঝে মাঝে আসেন বাগানে।

যদুপতিবাবুকেও তখন আসতে হয় এখানে। কারণ এখানের স্কুল, হাসপাতাল তৈরীর ব্যাপারেও মিঃ সেন সাহায্য করেন।

সেদিন মিঃ সেন বলেন যদুবাবুকে—মেয়ের বিয়ে দিতে হবে যদুবাবু। ইরাতো বড় হচ্ছে। যদুবাবু চেনেন ইরাকে।

ছোট থেকেই দেখেছেন, যদুবাবু বলেন—ইরার কি এমন বয়স! এখন থেকেই বিয়ে দেবেন। পড়ছে—

ইরাও এসেছে চা নিয়ে! সেও বলে,

—তাই বলুন কাকাবাবু! বাবার তো আমার বিয়ের জন্য ঘুম হচ্ছে না। বি. এ. এম-এটা পাশ করি, তারপর।

মিঃ সেন বলেন।

—যদুবাবু, একমাত্র মেয়ে, শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। কবে আছি কবে নেই। তাই মেয়ের বিয়েটা দিয়ে যেতে চাই. আর পাত্রও ভালো পেয়েছি। এয়ার ফোর্সের ক্যাপটেন—

যদুবাবু বলেন—অবশ্য বিয়ে তো দিতেই হবে, সময় মত দেওয়াই ভালো।

ইরার, ভালো লাগে না তাঁদের কথা।

সে বাগানের দিকে চলে যায়।

যদুবাবু অবশ্য ইরার বিয়েতেও গেছিলেন।

মিঃ সেন বেশ ধুমধাম করেই ইরার বিয়ে দিয়েছিলেন তাতে খরচের কার্পণ্য করেননি।

ওই বিয়েতেই দেখা হয়েছিল ভানু আগরওয়ালার সঙ্গেও। ভানু আগরওয়াল তখন তরুণ, মিঃ সেনের ওই বাগানবাড়ির পাশেই তার জুট প্রেস, বাংলো, বাগান। পাশাপাশি থাকেন এখানে। সেই সুবাদেই পরিচয় ওঁদের। আগরওয়ালা ইরাকে দিয়েছিলেন ঢাকা থেকে আনানো ঢাকাই জামদানী শাড়ি। ছোকরার রুচি আছে।

তারপরও বেশ কয়েকটা বছর পার হয়ে গেছে।

নিউ বসন্তপুর এখন আর শহরতলীর গ্রাম নয়। শহরের রূপই নিয়েছে। ষ্টেশন বাজারের সীমানাও বেড়েছে। আর দূর-

দুরান্ত অবধি ছেয়ে গেছে বাড়ি আর বিচিত্র কত নবাগত মানুষের ভিড়ে।

এদের অনেকেই অনেককে চেনে না। আগেকার সেই পরিচিতি, প্রীতির বন্ধনও হারিয়ে গেছে। গড়ে উঠেছে হৃদয়ের সান্নিধ্য ঘেঁষা পরিচয় নয় শুধুমাত্র মৌখিক পরিচয়। আর বড় হয়ে উঠেছে নিজেদের স্বার্থ। আদর্শ সামাজিক মূল্যবোধ এসব কিছুই নাই পাঁচ মিশেলী এই সমাজে।

এই বাতাবরণে বড় হয়ে উঠছে আমাদের আগামী প্রজন্ম। রমেশ এই প্রজন্মের সন্তান।

ছেলেবেলাতেই বিনা দোষে তার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে এক শ্রেণীর হিংস্র মানুষ। তার বাবা মা-ভাইকে খুন করেছে। তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে তাকে সর্বহারা করে পথে বের করে দিয়েছে।

তারপর প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে। বাঁচার এই লড়াই-এ সে ক্ষত-বিক্ষত। কোনদিন আহার জুটেছে, কোনদিন খেতেও পায় নি। যেখানে হোক শুয়ে রাত কাটিয়েছে। কাল কি খাবে জানে না।

এই জীবন থেকে তুলে এনে তাকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলেন যদুবাবু। রমেশ এখন স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে হায়ার সেকেণ্ডারী দিয়েছে।

আজ রমেশকে দেখে সেদিনের নিঃস্ব ছেলেটাকে কেউ খুঁজে পাবে না। যদুপতিবাবুর ওখানেই রয়েছে।

এখন সে যদুপতিবাবুর পরম স্নেহভাজনই।

ক'বছরেই রমেশ পড়াশোনায় ভালো রেজাল্ট করে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে কৃতিত্বের সঙ্গে।

দেবেনবাবু এখনও স্কুলের হেডমাষ্টারই রয়েছেন। যদুবাবু প্রেসিডেন্ট। দেবেনবাবুই সেক্রেটারী। ওর চেষ্টাতেই সেই ধ্বসে পড়া মাটির স্কুলের চেহারাই বদলে গেছে। দুটো বড় বড় তিন তলা বাড়ি—বিশাল পাঁচীলঘেরা স্কুলের এরিয়ার মধ্যে

খেলার মাঠ, ওদিকে আর বেশ কিছু জায়গা জুড়ে গড়ে উঠছে টানা চারতলা বাড়ি, ওটা দেবেনবাবু সায়েন্স ব্লক করতে চান।

কনস্ট্রাকশন চলছে বিশাল জায়গা জুড়ে।

বসন্তবাবুই ওই বিল্ডিং-এর ঠিকাদার। ভদ্রলোক ওপার থেকে এসে এখানে বাড়িঘর করে বাজারের ওদিকে ইট-বালি, সিমেন্টের গোলা করেছেন। বেশ বলিয়ে কইয়ে লোক।

যদুবাবুর সঙ্গে খাতিরও জমিয়েছেন। ওদিকে বাজার এলাকায় ওই সব নতুন দোকান পশারীদের মধ্যে গোকুল দাস এখন খুবই পরিচিত।

রাতের অন্ধকারে ওর দোকানের গুদামে ট্রাকবন্দী মালও আসে। বিদেশের অনেক মাল। গোকুলদাসের ভাই নকুল দোকান দেখাশোনা করে।

ক্রমশঃ ওদিকের পুরোনো বাসিন্দা বিষ্টু মাইতির টালির ঘর, ডোবাও হুমকি দিয়ে সস্তাদরে কিনে তাকে তুলে এখন আর একটা দোকান করেছেন।

গোকুল মোটর বাইক নিয়ে ঘোরে—এই অঞ্চলের মধ্যে এখন মাথা তুলছে সে। আর তার দলবল জুটেছে।

ওরা অনেক কিছুই করে।

রাতে বড় রাস্তার ওদিকে আসাম রোডে চা ভর্তি ট্রাকও মাঝে মাঝে ছিনতাই হয়। অন্য মালের ট্রাকও লুট হয়। পুলিশ যেন নির্বিকার, গোকুল দাস-এর নতুন বাড়ি উঠছে, মোটর বাইক ছেড়ে জিপে চলাফেরা করে।

নিউ বসন্তপুরের জীবনে গোকুলদাস একটি উজ্জ্বল নাম। বসন্তবাবু এখন এদিকে গোকুলকে ভজনা করেন, প্রণামীও দেন।

গোকুলদাস এবার এখানের স্কুল কমিটিতেও ঢোকার ব্যবস্থা করছে গার্জেন প্রতিনিধি হয়ে।

রমেশ আসে হেডস্যার দেবেনবাবুর বাড়িতেও। এখানে

আশেপাশে আগে ছিল বাঁশবন, ডোবা কারোও সবজীর ক্ষেত। তার ধারে দেবেনবাবুর একতলা বাড়ীটা ছিল নির্জন পরিবেশে।'

রমেশ তখন দু'একবছর হল স্কুলে ভর্তি হয়েছে, দেবেনবাবু তাঁর স্কুলের শত কাজের ফাঁকেও নজর রাখেন পড়াশোনায় যারা ভালো তাদের উপর। স্কুলের সুনাম বাড়ায় ভালো ছাত্ররা। তাদের আরও মনোযোগ দিয়ে পড়াতে বলেন শিক্ষকদের। স্পেশাল কোচিং ও দেবার ব্যবস্থা করেন। যাতে সেই ছেলেরা আরও ভালো ফল করে।

এইভাবে কোচ করিয়ে ছেলেদের ফাইনাল পরীক্ষায় পাঠান, ফলে এই স্কুলের রেজাল্টও ভালো হয়। এতদিন শিক্ষকরাও স্কুলের পর অনেকেই স্পেশাল কোচিং করাতেন স্কুলে।

কিন্তু ইদানীং ছাত্রদের ভিড় বাড়ছে, চারশো থেকে এখন সব সেকশন মিলিয়ে প্রায় বারোশ ছাত্র হয়েছে। সকালে হয় মেয়েদের স্কুল। সেখানেও সাত-আটশো ছাত্রী।

নতুন কিছু শিক্ষকও এসেছেন। আর স্থানীয় লোকদের হাতে পয়সাও কিছু আসছে, ফলে এইবার টিউশনির ব্যবসা জমে উঠেছে, বিশেষ করে স্কুলের শিক্ষক হলে তো কথাই নাই, ক্লাশের বেড়া টপকানো এত সহজ হয়। তাই শিক্ষকদের অনেকেই এখন বাড়িতে সকাল বিকাল পাইকারী হারে কোচিং ক্লাশ বসিয়েছেন।

দেবেনবাবু এই টিউশানিটাকে আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি বলেন এতে স্কুলের অন্য ছেলেদের বঞ্চিত করা হয়।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নগদ নারায়ণকে প্রত্যাখ্যান করার মত সাহস সকলের নেই। তাই এই চলছে। ফলে স্কুলের স্পেশাল কোচিংও বাধ্য হয়ে তুলে দিতে হয়েছে। শিক্ষকদের অনেকেই দেবেনবাবুকে এবার যেন সহ্য করতে পারছেন না।

আড়ালে সেকেণ্ড টিচার নরেশবাবু বলেন

—স্কুল যেন ও'র একার, এতকাল ধরে কি করেছেন তা জানি, অঙ্কের স্যার ভূষণবাবু বলেন

—টিউশানি করতে হয়, সংসারের চাপে কাছে এটা যেন মস্ত অপরাধ।

নরেশবাবু বলেন এবার ভোটে ওকে হাটাবোই, ওর তো রিটায়ার করার বয়স হচ্ছে, এবার যেতে হবে।'

সহকারী হেডমাষ্টার বিলাসবাবুর বাসনা তিনিই এবার হেডমাষ্টার হবেন। বিলাসবাবুকে ইদানীং মদত দেয় ওই গোকুল-দাসও। বিলাসবাবু গোকুলদাসের কথাতেই হেডস্যারকে বলে, কমিটিকে বলে বসন্তবাবুকেই নতুন চারতলা বিলডিং-এর কনট্রাক্ট পাইয়ে দিয়েছেন।

—অবশ্য দেবেনবাবুর ইচ্ছা ছিল স্কুল কমিটি থেকেই তদারক করে অন্য বিল্ডিং যেমন উঠেছে এটাও তেমনি উঠবে।

কিন্তু কমিটিই বিশেষ করে বিলাসবাবু, নরেশবাবু, ওই গার্জেনদের অন্যতম প্রতিনিধি গোকুলদাসই বলে

– কনট্রাক্ট দিন, তার কাছ থেকে আমরা কাজ বুঝে নেব। বাধ্য হয়ে দেবেনবাবু বলেন যদি ঠিকমত কাজ না করেন তিনি—কিন্তু তাঁর যুক্তি এই প্রথম নাকচ হয়ে গেল। ঠিকাদারকেই কাজ দিতে হলো।

দেবেনবাবু দেখছেন ওদের। মনে হয় স্কুলের সেই নিয়ম শৃঙ্খলা শুচিতাকেও এবার এরা বিঘ্নিত করবে, এই নতুন কমিটি।

স্কুলের কোচিং ক্লাসও উঠে গেছে। ছাত্ররা এখন টিউশানি দিয়ে পড়ছে মাষ্টারদের বাড়িতে। রমেশ স্কুলের অন্যতম সেরা ছাত্র। ইংরাজীতে খুবই ভালো। দেবেনবাবু বলেন।

—তুমি আমার বাড়িতে আসবে, ইংরাজী - অংক দেখিয়ে দেব।

রমেশ জানে তাকে পায়ের তলে মাটি পেতেই হবে।

যদুপতিবাবুর বাড়িতে থাকে খায়। জামা কাপড় বইও কিছু দেন যদুবাবু।

তাঁরও আয় কমে আসছে। রমেশকে প্রাইভেট টিউশানি দেবার

মত টাকা তাঁর নেই। কারণ ইংরাজী, অঙ্ক দু সাবজেক্টে প্রাইভেট কোচিং এর রেটও অনেক বেড়ে গেছে। মাসে তিনশো টাকা প্রায় পড়বে। যদুবাবুর নগদ টাকা তত নেই। রমেশ নিজেই চেষ্টা করতো। এবার হেডস্যারের আশ্বাস পেয়ে রমেশ যেন হাতে চাঁদ পায়।

তখন থেকেই হেডস্যারের বাড়িতে আসছে রমেশ। ফাঁকা জায়গাগুলো এই কবছরে ভরাট হয়ে বড় বড় দুতলা, তিন তলা বাড়ি উঠেছে। ওদিকে সহকারী হেডমাষ্টার বিলাসবাবুর তিন তলা বাড়ী উঠেছে।

অংকর স্যার এর বাড়িটাও সুন্দর। তিনি মোটর বাইক নিয়ে স্কুলে যান। আর পরেশবাবু তো এখন বাড়িতে বিরাট কোচিং ক্লাশ করেছেন। তাঁর এখন রমরমা অবস্থা।

আর দেবেনবাবু হেডমাষ্টার হয়েও সেই একতলা বাড়িতে রয়েছেন। সংসারে এখন তাঁর স্ত্রী বিজয়া ছাড়াও এসেছে তাঁর বড় মেয়ে সাবিত্রী আর ছোট ছেলে লালু।

সাবিত্রী এখন স্কুলে ক্লাশ টেনে পড়ছে, লালু পড়ছে ক্লাশ এইটে।

রমেশ এখন এবাড়ির ছেলের মতই হয়ে উঠেছে। বিজয়াকে কাকীমা বলে ডাকে। বিজয়াও জানে রমেশের অতীতের ইতিহাস। একেবারে অনাথ। যদুবাবুর দয়াতে মানুষ হচ্ছে।

বিজয়াও স্নেহ করে ওকে।

দেবেনবাবু অবসর সময়ে ছেলেমেয়েকে নিয়ে বসেন পড়াতে। ওই সময় রমেশ আসে।

বিজয়াও এসময় চা মুড়ি—না হয় চিড়ের পোলাও যাই জল-খাবার করে রমেশকেও দেয়।

দেবেনবাবু বলেন—রমেশ হায়ার সেকেণ্ডারীতে ইংরাজীতে ভালো নাম্বার না পেলে ইংলিশে অনার্স পাবে না। এম-এ করার

অসুবিধে হবে। ইংলিশে এম-এ করতে পারলে আমি থাকাকালীন এখানের স্কুলে জয়েন করবে।

বিজয়ার রমেশকে ঘিরে ক্ষীণ একটা স্বপ্ন রয়ে গেছে। ছেলেটি ভালো। চেনা জানা। নিজের পায়ে যদি দাঁড়াতে পারে তার মেয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে মানাবে ভালো।

কিন্তু বিজয়া বলে—ওকেও মাষ্টারিতে ঢোকাবে? নিজেতো সারাজীবন পরের ছেলের ভবিষ্যৎ আর ইস্কুল গড়ার স্বপ্নই দেখলে। নিজের কি সুরাহা হ'ল?

ওই নরেশবাবু, বিলাসবাবুদের দেখছো? তিনতলা বাড়ি—গাড়ি কি নেই তাদের? আর তোমার?

দেবেনবাবু এর জবাব দিতে পারেন না। ভালো ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য তাঁর নেই। ছোট ছেলে লালুও পড়াশোনায় তেমন ভালো নয়।

টেনেটুনে পাশ করে মাত্র।

এই বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে আজকের দিনে জীবনে উন্নতি করা অসম্ভব। তার ভবিষ্যত কোন আশার সন্ধানই দিতে পারে না। বিজয়াও সেই আশ্বাস পায়নি নিজের ছেলে-মেয়ের কাছে, স্বামীর কাছেও।

তাই যেন রমেশ, ওই পরের ছেলের উপরই আস্থা রাখতে চায়।

তরুণ রমেশও যেন কি ক্ষীণ স্বপ্ন দেখে। এই বয়সে অভাব-এর কথাও মনে ছায়া তত গভীর ভাবে ফেলতে পারে না। মনে স্বপ্নটাই বড় হয়ে ওঠে।

সাবিত্রীও দেখেছে রমেশের চোখে তেমনি কোন নেশার সাড়া। পড়াশোনা শেষ করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সাবিত্রী বের হবে কোন বান্ধবীর বাড়ি—এই দিকেই। চলেছে সাবিত্রী।

রমেশের ডাকে চাইল—কোথায় চল্লে?

সাবিত্রী বলে—দিনভোর পড়া আর পড়া। তোমার তো

পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি বাপু হাঁপিয়ে উঠেছি। বেরুচ্ছি গোপাদের ওখানে।

রমেশ বলে– পরীক্ষা হয়ে যাক। চলো একদিন কলকাতা বেড়িয়ে আসবো। চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, গড়ের মাঠ।

সাবিত্রী বলে—সত্যি!

রমেশ জানায়—হ্যাঁ।

সাবিত্রী শোনায়– পরীক্ষা শেষ হলে খুব ঘুরবো দুজনে। আইসক্রীম খাওয়াতে হবে কিন্তু। আর ভালো একটা সিনেমা দেখবো, মেট্রো, লাইটহাউসে—

রমেশও বলে– তাই হবে!

রমেশের পরীক্ষা হয়ে গেছে। রমেশ এখন কিছুটা হাল্কা। যদুপতিবাবুর চিঠিপত্র লেখা, কলকাতায় কিছু যোগাযোগ করার কাজ করে। ওদিকে ভানু আগরওয়ালের বাংলোতেও যায় মাঝে মাঝে। ওপাশে মিঃ সেনের বিশাল বাগান বাড়িতেও যায় রমেশ। ইরা সেনের বিয়ে হয়েছে, ওর স্বামী প্লেনের পাইলট। ভদ্রলোক এলে রমেশও যায়।

প্লেনের গল্প শোনে, ভানু আগরওয়ালও আসে সেখানে। সন্ধ্যার পর ইরা সেনের বাংলোর বাইরের চাতালে গার্ডেন চেয়ার পেতে খানাপিনার আয়োজন চলে।

রমেশ ওখানেই দেখে বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের মদ্যপান করতে। ইরাও মাঝে মাঝে যোগ দেয়। সেজেগুজে প্রজাপতির মত দেখায় ওকে। রমেশের মনে হয় ইরা যেন পরীর মত হাওয়ায় ভর করে চলে, মাটিতে পা রেখে হাঁটে না।

ইরার স্বামী বরেণ বলে রমেশকে– ইয়ংম্যান, কলেজে পড়বে। নাউ এ জেণ্টেলম্যান। চালাও দু এক পেগ। সোসাইটিতে মিশতে গেলে এটারও দরকার। কি ভানু?

ভানু আগরওয়াল অবশ্য ভালোই পান করে। সে বলে– কি রমেশ?

ইরাই বলে—নিজেরা খাচ্ছো খাও, ওর মাথাটা খাবে কেন ?

বাজারের ওই দু নম্বর ব্যবসায়ী গোকুলদাসও আসে মাঝে মাঝে। সেও তার জিপের থেকে দু'একটা আসলি স্কচের বোতল বের করে।

গোকুল বলে—রমেশ, আমাদের ভেরি গুড বয়। নো নেশা! বুঝলি রমেশ, তোকে আরও বড় হতে হবে। যদুবুড়োর কাছে রাজনীতির মার প্যাঁচগুলো বুঝে নে। তারপর তোকেই এখানের নেতা বানিয়ে দেব। ওই বুড়ো হাবড়াদের আউট করে দেব। দেখবি গোকুলদাস এর এলেম।

রমেশ শুনেছে ওর কথাগুলো।

পায়ের তলে তার মাটি নাই। ঘরের ঠিকানাও নাই। শুধু পেয়েছে আঘাত আর অবহেলা এই সমাজের কাছ থেকে। এই মাটিতেই তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। নিজের আখের গুছিয়ে নিতে হবে।

তাই রমেশ আসে এই মহলে। বেশ জেনেছে রমেশ নিউ বসন্তপুরের আগামী দিনের মানুষ হবে এরাই।

ওই যদুবাবুদেব দিন শেষ হয়ে আসছে এটা তার মনে হয়। আর সে যুগেই দরকার হবে গোকুলদাস, তার দলবলদের। ওরাই সমাজের সর্বস্তরে ঠেলে উঠবে।

এখন থেকেই গোকুলদাসের দলের পীনু, বুলুরা এই এলাকায় মাথা তুলেছে। ওদের মদত দেয় গোকুল।

ষ্টেশন ছাড়িয়ে বাজার এলাকা।

এখন ওখানে বড় বড় ঝকঝকে দোকান পশার উঠেছে। আর ওদিকে কাঁচা বাজার বসে। পাশে মাছের বাজার। বাজারের এলাকা বেড়ে গেছে পথের দুদিকে। বহুদূর অবধি লোকজন আনাজ পত্র নিয়ে বসে।

ওই ফড়ে দোকানদারদের কাছে রোজ দুটাকা তিন টাকা পাঁচ টাকা করে তোলা তোলে ওই পীনু, বুলুর দল।

প্রথমে তারা দিতে চায়নি। তাই নিয়ে মারপিট, বোমবাজিও করে ওরা। হঠিয়ে দেয় ওই ফড়েদের।

তারা শেষ অবধি বাধ্য হয়েই এদের রোজ কিছু প্রণামী দিতে বাধ্য হয়।

পিনু বুলুদের মারফৎ গোকুলদাসের রোজ আমদানী মন্দ হয় না। এবার পিনু, বুলুরা এলাকা বাড়াবার চেষ্টা করছে।

রমেশের রেজাল্ট বের হয়েছে। কৃতিত্বের সঙ্গে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে সে। ইংরাজীতে ভালো নম্বরও পেয়েছে।

যদুপতিবাবু বলেন—কলেজে ভর্তি হয়ে যা।

রমেশও তাই চায়। কিন্তু আড়ালে গবু বলে বড়বাবু, সংসারের ঘটাও বেড়েছে। এতগুলো টাকা মাসে মাসে খরচ করবেন?

যদুপতি বলেন—ছেলেটার পড়া হবে না? ও কোনমতে চলে যাবে।

রমেশ ভর্তি হয়ে গেল কলেজে।

দেবেনবাবুও খুশী হন। বিজয়াও।

বিজয়া বলে—রমেশ দেখবে কলেজেও ভালো রেজাল্ট করবে!

রমেশও তা জানে। তাকে ভালোভাবে পাশ করতেই হবে, এই তার ধ্যান জ্ঞান, সাবিত্রীকে নিয়ে সেদিন বের হয়েছে রমেশ কলকাতায়।

সাবিত্রী ওই নিউ বসন্তপুরের জগৎ থেকে কলকাতার পরিবেশে এসে খুশীতে যেন নেচে ওঠে।

দুজনে চলেছে চিড়িয়াখানার মধ্যে, গাছ গাছালি ঘেরা ফুল ফোটা জগৎ। বিলের জলে দূরাগত পাখীদের কলরব উঠে, ওদিকে হরিণের দল, ময়ূর—এক বিচিত্র জগতে সাবিত্রী যেন হারিয়ে যায়।

গড়ের মাঠে ঘাসে বসে দুজনে ভিক্টোরিয়ার ওদিকে। বিলের ধারে গাছের ছায়া নামে, এদিকটা বেশ নিরিবিলি।

রমেশ এর মধ্যে কোথা থেকে দুটো আইসক্রীমও এনেছে।

সাবিত্রী খুশি হয়!

—ও মা, এতো!

রমেশ বলে নাও!

আজ রমেশও এই নির্জন সবুজে যেন আরও অনেক স্বপ্ন দেখে। তার কাঙ্গালমন অনেক কিছুই পেতে চায়!

এতকাল সে শুধু বঞ্চনাই সহ্য করেছে। এবার সেই বঞ্চনা ভুলে সে পাবার কথাই ভাববে।

তাকে ধাপে ধাপে উঠতে হবে উপরে। পথের মানুষের পরিচয় ভুলে সে হবে সমাজের একজন, তার জন্য দেবেনবাবু, যদুপতিবাবু, ওই গোকুলদাস এমনকি ভানু আগরওয়াল দরকার হলে ইরা বোনকেও হাতে আনবে।

সাবিত্রীকেও পেতে হবে তাকে। সব কিছুরই দখলদারী পেতে চায় আজকের রমেশ। তার মনে সেই লোভী সত্তাটা যেন ধীরে ধীরে মাথা তুলছে।

সাবিত্রীর হাতখানা ওর হাতে।

ওই স্পর্শটুকু রমেশের মনে যেন ঝড় তুলেছে। এমনি একটি দিনের সুযোগ খুঁজছিল রমেশ!

—সাবিত্রী!

সাবিত্রী অবশ্য এত গভীরভাবে ব্যাপারটাকে নেয় নি। তার চোখে রমেশের বিশেষ কোন পরিচয় নেই।

বাবার বহু ছাত্রদের মধ্যে সে একজন মাত্র। তার চেয়ে বাবার অন্য ছাত্র যতীনকে অনেক উঁচু দরের বলে মনেহয়, সাবিত্রীর।

যতীনরা ওই নিউ বসন্তপুরের আগেকার বাসিন্দা।

স্কুলের ওদিকে ওদের বাড়ি। বেশ বনেদী পরিবার, তার তুলনায় রমেশের কোন পরিচয়ই নাই, সাবিত্রীও জানে যদুবাবুর দয়ায় সে মানুষ। তার বাবাও তাকে বিনা পয়সায় পড়িয়েছেন।

যতীন এখন কলেজে পড়ছে। অনেক ভদ্র—আর তার সঙ্গেও মিশেছে সাবিত্রী। রমেশের মনে যেন বাড় উঠেছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সাবিত্রীকে আজ বুকে টেনে নিতে চায়। দখল করতে চায় ওকে।

চমকে ওঠে সাবিত্রী।

এ সে ভাবতেই পারেনি। উঠে পড়ে সে!

রমেশ ওকে বসাতে চায়,- বসো না!

—না! সন্ধ্যা হয়ে গেছে; বাড়ী ফিরতে হবে, চলো।

সাবিত্রী কঠিন স্বরে কথাটা জানায়।

রমেশ বলে—হোক না!

—না?

রমেশ বলে যতীনেব সঙ্গে দেখি বিলের ধারে সন্ধ্যার পরও ঘোবো, হেসে কথা বলো, আমি কি দোষ করলাম?

সাবিত্রী যতীনের কথায় বলে,—

– তাব সঙ্গে তোমার তুলনা করোনা।

—কেন? চটে ওঠে রমেশ—আমি কম কিসে?

সাবিত্রী শোনায় কঠিন স্বরে।

—তোমার নাম পরিচয়ও নাই, বানে ভাসা খড় কুটো, পরের দয়ায় মানুষ হচ্ছো, যতীন তা নয়, তোমার মত কাঙ্গাল সে নয়। তফাৎ টা আরও, সেটা নিজেই ভেবো, বুঝতে পারবে।

রমেশ চমকে ওঠে, আজ বহুদিন পর যে কথাটাকে সে ভুলতে চেয়েছিল, সেই কথাটাই আজ কঠিন ভাবে বলেছে সে। রমেশ নীরব রাগে জ্বলে ওঠে।

তবু তখনকার মত চেপে গেল সে ব্যাপারটা, বেশ বুঝেছে সাবিত্রী তাকে মেনে নিতে পারে নি!

মনে হয় রমেশের শুধু সাবিত্রীই নয়; অনেকেই তার সম্বন্ধে মনেমনে এই ধারণাই পোষণ করে।

রমেশ তাদের দেখিয়ে দেবে যে পথের নাম পরিচয়হীন মানুষটা

জীবনে অনেক কিছু পেয়ে সমাজের মাথায় উঠবে।

উঠতেই হবে তাকে একদিন, এই মানুষগুলোকে সে জবাব দেবেই।

মুখবুজে ওরা ফিরে আসছে ট্রেনে।

সাবিত্রী ও গম্ভীর হয়ে গেছে। যে মন নিয়ে বের হয়েছিল সে খুশীর বিন্দুমাত্র আর নেই।

যতীনও ফিরছে কলেজ থেকে।

সন্ধ্যার লোকাল ট্রেন, ভিড়ে ঠাসা। প্লাটফর্মে'ও লোকজনের ভিড়। ওই ভিড়ের মধ্যে এক নজর দেখেছিল যতীন, সাবিত্রী আর রমেশকে।

তারপর আর দেখতে পায় নি। ওরা বোধ হয় অন্য কোন কামরায় উঠেছে। স্টেশনে নেমে দেখে ওরা সামনের দিকে ছিল, গেটপার হয়ে রিক্সা নিয়ে চলে গেল।

যতীন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না।

রমেশ যতীনকে চেনে।

ছেলেটা হেডস্যারের বাড়িতেও যায়। সেখানেই দেখেছে তাকে। এখন যতীন এম-এ পড়ছে। তার সাবজেক্ট ত ইংরাজী। তাই যতীন আসে হেডস্যারের ওখানে ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও হয়।

দেবেনবাবুই বলেন রমেশকে

—যতীন ইংরাজি অনার্স নিয়ে পাশ করে এম-এ করছে। তোমাকেও ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে পাশ করতে হবে।

রমেশ বলে চেষ্টা করছি স্যার।

রমেশ দেখেছে সাবিত্রী বের হয়ে গেল।

তার একটু পরেই যতীনও বের হয়ে যায়।

যতীন চলেছে বাগানের ওদিকে। সাবিত্রীকে দেখে চাইল। সাবিত্রী সেখানে তারজন্যই অপেক্ষা করছিল। যতীন এগিয়ে আসে, বলে সে

—কাল কলকাতায় গেছলে ?

সাবিত্রী যতীনকে চেনে। বলে সে

—তোমাকে কত করে বল্লাম যতীনদা, কলকাতায় বেড়াতে যাবো, একদিনও নিয়ে গেলে না। রমেশ কাল কলকাতা যাচ্ছিল, চলে গেলাম ওর সঙ্গে।

—তাই নাকি ! যতীন শুধায়—তা কেমন ঘুরলে ?

সাবিত্রী বলে—ছাই। মানুষকে চিনতে সময় লাগে। কাল চিনেছি ওটাকে। একদম বাজে ছেলে। লোভী—স্বার্থপর—নীচ।

হাসছে যতীন, বলে সাবিত্রী

—হেসো না। তোমার উপরই রাগ হচ্ছিল। তুমি কি আমার কথা এতটুকুও ভাবো না ? তাহলে হয়তো আনন্দ করে কলকাতা বেড়িয়ে আসতাম। কালকের দিনটাই মাটি হয়ে গেল ওই লোভী ইতরের জন্য।

যতীন বলে—তাহলে কলকাতা যাবার সখ মিটেছে ?

সাবিত্রী শোনায়—সেটা মিটেছে কিনা জানি না। তবে একটা মানুষকে চিনেছি।

যতীন বলে -আমার উপর এত বিশ্বাস ? যদি আমিও কিছু করি।

সাবিত্রী হেসে ওঠে সলজ্জভাবে বলে

—সে দুঃসাহস তোমার নেই। থাকলে সাবিত্রী তা বুঝতে পারতো আগেই।

যতীন বলে—সামনে পরীক্ষা। কিছুদিন ব্যস্ত থাকবো। পরীক্ষাটা হলে তারপর বেরুবো তোমাকে নিয়ে।

—সত্যি ! সাবিত্রী যেন স্বপ্ন দেখছে। বলে সে—তাই চলো যতীনদা। ওই রমেশটাকে আমিও ঘেন্না করি। নাম ঠিকানা নেই, ও বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চায়। তোমার সঙ্গে ওর তুলনা করে!

যতীন বলে—খুব রেগে গেছো দেখছি। চল—চা খাবে বাড়িতে। দুজনে চলেছে বাগান পার হয়ে চলেছে যতীনদের বাড়ির দিকে, ওরা কেউ লক্ষ্য করেনি। রমেশও এসেছে সাবিত্রীর পিছনে, সেও দেখেছে যতীনের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ এর নিভৃত জায়গাটা।

শুনেছে একটা ঝোপের আড়াল থেকে সাবিত্রীর ওই কথাগুলো। রমেশের মনে হয় সাবিত্রী যতীনকেই বেশী ভালোবাসে।

তার মত নাম পরিচয়হীন ছেলেকে তাই কাল নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। রমেশের মনে সেই চাপা রাগটা জেগে ওঠে।

তাকে আরও বড় হতে হবে। এই এলাকার ওই যতীনকে আরও অনেককে সে ছাপিয়ে গিয়ে এখানের একজন কেউকেটা হবে। এ তাকে হতেই হবে। তারজন্য যে কোন পথই নিতে হয় তাকে, নেবে সে।

তাই রমেশ গোকুলদাসের ঠেকেও আসে।

অবশ্য দিনের বেলায় গোকুলদাস নানা কাজে অকাজে ব্যস্ত থাকে। বাজারের তোলা আদায় করে তার ছেলেরা, কার জমির দখল নিতে হবে, কোন্ বাড়ির ভাড়াটেকে ওঠাতে হবে, কোন্ মহাজনের ওপার থেকে রাতের বেলায় কিছু বেআইনী মাল চালান আসবে, সেগুলোকে ঠিকমত এনে দিতে হবে।

তারজন্য পুলিশকে হাতে আনতে হবে।

এসব কাজে গোকুলদাস কিছু টাকা নেয় বটে তবে সব কাজই সে করে দেবে।

এসব ছাড়াও গোকুলদাস এখন এখানে রিফিউজীদের অন্যতম দলনেতা। মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে শোভাযাত্রা, জেলাসদরে ধর্না—এসবের আয়োজন করে পরম জনদরদী সমাজসেবকও সাজছে।

রাতের বেলায় গোকুলদাস এর বৈঠক বসে ভানু আগরওয়ালের বাংলোয়। ভানুই মদ টদ যোগায়। ভানু চাইছে এখানে পাওয়ারলুম কয়েকটা বসাতে। গোকুলদাসও তাকে মদত দেবে।

রমেশ এখানে গোকুলের কাছে আসে।

রমেশও আসলে ছিন্নমূল। যদুপতিবাবু তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাকে পড়াচ্ছেন। তবু রমেশ জানে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। গোকুলদাস এর বিদ্যে কি তা গোকুলই জানে না। ক্লাশ নাইন অবধি গড়ান দিতে দিতে উঠে আর বেড়া টপকাতে পারে নি।

তিনবছর ক্লাশ নাইনে ছিল। শেষে দেবেনবাবু বলেন—আর তোর কিছু হবে না, সিটটা ছেড়ে দে। অন্য একজন ছেলে পড়তে পাবে।

গোকুল অবশ্য ছেড়ে দিয়েছিল, এখন তার দলের হ্যাণ্ডবিল, লিফলেট লেখাতে হয় ওজস্বিনী ভাষায়। চাঁদা আদায় হয় সমিতির জন্য, গোকুল উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির কাজে কলকাতা, দিল্লী যাবে, নেতাদের ধরতে হবে এই সব বলে ভালোই চাঁদা তোলে। আর তার থেকে রমেশকেও বিশ পঞ্চাশ টাকা দেয়। রমেশ ওসব লেখালেখি করে, চিঠির জবাব দেয়।

গোকুল বলে—রমেশ, বি-এ পাশ কর। আর এলাকার মানুষদের মাঝে মেলামেশা কর আমার দল থেকে তোকেই ভোটে দাঁড় করাবো।

রমেশ কি ভাবছে। ভোটে জিতে এই এলাকার নেতা হবে।

গোকুল বলে চাকরী করে কি মাইনে পাবি? নেতা হতে পারলে ব্যস! যা চাস তাই পাবি।

রমেশও তাই চায়। তাকে অনেক কিছু পেতে হবে। বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেছে। ভালোই দিয়েছে পরীক্ষা।

পরীক্ষা দিয়ে সেদিন রমেশ গেছে দেবেনবাবুর বাড়িতে।

সাবিত্রীর কথা মনে পড়ে। বেশ ক'দিন যেতে পারেনি। তাই গেছে আজ।

বাইরের মাঠে দেবেনবাবুর ছেলে লালু পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে। লালু ছেলেটা এর মধ্যেই বেশ বড় হয়ে উঠেছে। পাড়ার ছেলেদের মধ্যেও বেশ জনপ্রিয়।

রমেশকে দেখে লালু বলে—রমেশদা, তোমার গোকুলদার দল বাজারে খুব জুলুম করছে ফড়েদের উপর। ওকে একটু বুঝিয়ে বলো।

রমেশ একটু অবাক হয় লালুর কথায়। গোকুলের সঙ্গে রমেশের যে ঘনিষ্ঠতা সেটা বাইরের অনেকেই জানে না। বাইরের লোক সেটা জানুক সেটা রমেশও চায় না। যদুবাবুর কানে কথাটা উঠলে যদুবাবু রেগে যাবেন। কারণ গোকুলদাস এর দল এখানের ওই যদুবাবুদের সহ্য করতে পারে না। তারা এখানে এসেছে, এখানে তারাই হবে সর্বেসর্বা। এখানের কাউকে মানার দরকার বোধ করে না গোকুল। কারণ যদুবাবুরা বাজারের ওই জোর করে তোলা তোলার ব্যাপারটাকে মেনে নেয় নি।

মেনে নিতে পারে না গোকুলের দলের পিনু, বুলুদের বোমবাজী। গোকুলের ওই স্কুল কমিটিতে নাক গলাবার চেষ্টাকেও।

রমেশ লালুর কথায় বলে—ওসব ব্যাপার নিয়ে ভাবি না লালু, তোমরাই বল গোকুলদাকে।

লালু বলে—দরকার হলে বলতে হবে এবার।

রমেশ দেখছে একদল তরুণ যেন ধীরে ধীরে মাথা তুলছে গোকুলদাসের জুলুমের বিরুদ্ধে। চতুর রমেশ কোন কথা বলে না। ও শোনে মাত্র। এখানের আবহাওয়া যে ভারি হয়ে আসছে তা বুঝেছে সে।

রমেশ শুধোয়—হেডস্যার আছেন ?

লালু বলে—ছিল তো বাবা! যান—দেখুন।

দেবেনবাবু, বিজয়াও আজ খুশী হয়েছে। যতীন ফার্স্টক্লাশ পেয়েছে এম-এতে। দারুণ রেজাল্ট করেছে আর তাই কোন নামী কলেজে অধ্যাপনার কাজও পেয়েছে কলকাতায়। যতীন এসেছে একরাশ মিষ্টি নিয়ে দেবেনবাবুকে প্রণাম করে সেই সুখবরটা দিতে।

সাবিত্রীও আজ খুশি হয়েছে।

প্লেটে করে সেইই এনেছে সন্দেশ। যতীন বলে—এত খাবো?

বিজয়া বলে—এনেছে খাও।

দেবেনবাবু শোনান—অধ্যাপনা করো, তবে সেই সঙ্গে ডক্টরেট এর জন্য তৈরী হও যতীন। আমার ছাত্রদের মত অনেকেই দেশ বিদেশে নাম করেছে। অন্য সাবজেক্টে ডক্টরেটও আছে অনেক। তুমি ইংরাজীতে ডক্টরেট করো। অধ্যাপনাতে উন্নতি করতে গেলে তোমাকেও ভালো ছাত্র হতে হবে।

বিজয়াও খুশি হয়েছে। জানে যে সাবিত্রী ভালোবাসে যতীনকে। ওদের দুজনে যদি ঘর বাঁধে তাদের একটা মহাদায় মুক্তি ঘটবে। ছেলেটার কি গতি হবে জানে না। লালু যেন নিজের মতেই চলতে চায়। দেবেনবাবু পরের এত ছেলেকে মানুষ করে, নিজের ছেলের কাছে হার মেনেছেন।

তবু মেয়েটা ভালো ঘরে পড়বে, মা হয়ে বিজয়া এইটাই চায়।

এমন সময় রমেশ এসেছে।

হঠাৎ এই আনন্দের আসরে ঢুকে রমেশ নিজেকেই যেন বেমানান মনে করে।

সাবিত্রীও কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। রমেশ দেখেছে সেটা।

দেবেনবাবু বলেন—এসো রমেশ। যতীন এম-এতে ফার্স্টক্লাশ পেয়ে কলকাতার কলেজে অধ্যাপনা করছে, এসো। সাবিত্রী রমেশকে সন্দেশ দে। মিষ্টিমুখ করো।

যতীন দেখছে রমেশকে। রমেশ এড়াবার চেষ্টা করে—এই খেয়ে এলাম।

দেবেনবাবু বলেন—ইয়ং ম্যান, দুটো সন্দেশ খেতে ঠিকই পারবে, হাজার হোক তোমরা গুরু ভাই। খুশীর খবরে খুশী হবে না?

রমেশ বোদা মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বলে, নিশ্চয়ই।

দেবেনবাবু বলেন—তোমার রেজাল্টও ভালোই হবে, বি-এ করে কি পড়বে?

রমেশ জানে তার নিজের হাতে এসব কিছুই নেই, তার ইচ্ছাও নেই পড়ার, মনে হয় গোকুলদাসের সঙ্গেই ভিড়ে যাবে। তবু মন চায় পড়তে। বেশ জানে লেখাপড়া না জানলে কোথাও পায়ের তলে মাটি মিলবেনা। অথচ পড়ার সঙ্গতি তার নেই। তাই বলি —দেখি কি হয়।

যদুপতিবাবু দেখছেন কয়েক বছরের মধ্যে সমাজের রূপটা বদলে যাচ্ছে দ্রুত। এই শান্ত বসন্তপুরের চেহারাই বদলে গেছে আর নামটাকেও বদলে দিয়েছে ওরা, ওরা বলে নিউ বসন্তপুর। রেললাইনটা পাশ দিয়ে গেছে। ওই জনতার দলই জোর করে রেল অবরোধ করে, গোলমাল হৈ-চৈ অনেক হয়, তারপর এখানে রেল-ষ্টেশন হয়েছিল, তার নামও নিউবসন্তপুর।

যদুবাবু দেখছেন বাজারে ওদের জুলুম।

কোন কারখানাতেও হানা দেয় ওরা, তাদের চাকরী দিতে হবে।

গোকুলদাস তাদের নেতা।

কারখানার মালিক বলে এরা কাজ জানেনা। মেসিন চালাতে হবে। এ কাজ সবাই পারবেনা।

গোকুলদাস শোনায়—শিখিয়ে নেবেন, এদের কাজ দিতেই হবে এখানে কারখানা চালাতে গেলে।

ওদিকে গেটের বাইরে ক্রুদ্ধ জনতা গর্জন করে,—ইনকিলাব, জিন্দাবাদ, আমাদের দাবী মানতে হবে।

মালিককে ঘেড়াও করে রাখে তারা একটা দিন! শেষে মালিক চাকরী দিতে রাজী হয়ে ছাড়া পায়। তার তিনদিন পরই মালিক কারখানা তালাবন্ধ করে প্রাণ নিয়ে সরে পড়ে। এদের চাকরীতো গেলই, যে তিরিশ চল্লিশজন কাজ করছিল তাদের চাকরীও চলে গেল।

গোকুলদাসের দল গর্জায় কারখানা চালাতেই হবে। কৌটা বাজিয়ে কিছুদিন চাঁদাও তোলা হল বেকার শ্রমিকদের জন্য। তারপর সব চুপ চাপ। চাকরী হারিয়ে কিছু লোক বেকার হয়ে গেল। গোকুলও তাদের আর চেনে না। যদুপতিবাবুর বয়স হয়েছে।

স্বাধীনতার পর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নটা যেন শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে!

জেগে উঠছে এক নতুণ সমাজ শাসন শোষণ অবক্ষয় যেখানে সারসত্য। ক্রমশঃ ক্লান্ত হতাশই হন তিনি। দেখছেন চারিদিকের এই পরিবর্তন!

তবু তিনি অন্তরের সেই প্রীতিকে বিসর্জন দিতে পারেননি। রমেশ বি-এ পাশ করেছে, অনার্সও পেয়েছে, সেকেন্ড ক্লাশ অনার্স। যদুবাবু বলেন

—ল' কলেজে ভর্তি হয়ে যাও রমেশ, এম-এটাও পড়ো ওই সঙ্গে। আইন পাশ করা থাকলে ওকালতিও করতে পারবে। রমেশ এর মাথায় কথাটা ঘোরে গোকুলদাসের কথা। ওকে নেতা বানাবে সে, আর আইনের মারপ্যাঁচ জানা থাকলে ওই কাজেও লাগবে এটা। তাই রমেশ এম-এর সঙ্গে ইভনিং-এ ল' কলেজেও ভর্তি হয়ে গেল। পড়ার চাপ বাড়বে, তা বাড়ুক। রমেশ জানে আর দুটো বছর তাকে কষ্ট করতেই হবে, সারা জীবনের তুলনায় দুটো বছরের কষ্ট আর তেমন কিছু নয়!

যতীন এম-এ, রমেশকে তার বেশী কিছু করতেই হবে। বোর্ড লাগাবে সে রমেশ ঘোষ এম-এ এল-এল-বি।

মিঃ সেন এর বাগান বাড়িটা প্রায় অনাদৃত হয়ে পড়েছিল। মিঃ সেন নিজে সখ করে বাগানটাকে সাজিয়েছিলেন, তিনি মারা যাবার পর ইরা ওর স্বামীকে নিয়ে মাঝে মাঝে আসতো।

ভানু আগরওয়াল গোকুলদাসরাও এসে জুটতো তখন। রমেশও আসতো মাঝে মাঝে।

তারপর ইরার স্বামী বোম্বাই এ বদলি হয়ে চলে যায়। বাগানটা মালির জিম্মাতেই পড়ে থাকে। এই ভাবেই চলছিল।

হঠাৎ সেদিন রমেশ দেখে বাংলোতে আলো জ্বলছে একটা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে ভিতরে। সন্ধ্যার মুখ।

রমেশ কি ভেবে ভিতরে যায়।

ড্রইংরুমে আলো জ্বলছে। ওকে দেখে কে ডাকে।

—আরে রমেশ না! এসো—এসো—

রমেশ এগিয়ে যেতে ইরা সেন বের হয়ে আসে।

ক' বছর পর দেখছে রমেশ ইরাকে।

ইরার বয়স বাড়েনি বলেই মনে হয়, মনে হয় বরং আরও স্কিম, সুন্দরীই রয়েছে সে। ফর্সা মোমমাজা কাঁধের উপর চুলগুলো লুটোপুটি খায়।

দেহের রেখাগুলোও সোচ্চার। ওকে ঘিরে দামী পারফিউমের মিষ্টি গন্ধটা ছড়িয়ে আছে। দুচোখের তারায় হাসির ঝিলিক।

—এসো রমেশ। এখনতো তুমি দেখছি সাইনিং ইয়ং ম্যান। কি নেবে? হুইস্কি—জিন—

রমেশ ওর কথায় অবাক হয়। অবশ্য উপরতলার কিছু মানুষদের দেখেছে সে। মায় পথ থেকে যারা উপরে উঠছে তাদেরও।

এখন তারা চা কফি খায় না। খায় ওই সব দামী পানীয়ই।

রমেশ বলে—না না। বরং চা—

ইরা বলে—ব্যস! ওকে।

বেয়ারাকে চায়ের কথাই বলে। রমেশ বলে

—কর্তাকে দেখছি না ?

ইরা বলে—তিনি তো নেই মাস ছয়েক আগে প্লেনক্র্যাসে মারা গেল। তারপর ওখানের পাট চুকিয়ে ওর টাকাপত্র নিয়ে কলকাতা ফিরলাম। এখানেও ফিরে কিছু একটা নিয়ে এনগেজ থাকতে চাই। তাই এখানে এসেছি। এদিকের তো এখন লোকালিটিই বদলে গেছে। ভাবছি এই বাগানের ওদিকের বাড়িগুলোয় একটা ইংলিশ মিডিয়ম কিণ্ডার গার্ডেন স্কুলই খুলবো।

রমেশ দেখছে এখানের নতুন সমাজের মানুষদের। ওই স্কুলে ত ছোটদের পড়াবার ব্যবস্থাও সীমিত। দু একটা প্রাইমারী স্কুল হয়েছে, তা সাধারণ ইতিজনদের জন্য। এখানের গজিয়ে ওঠা নতুন ধনীদের ছেলেমেয়েদের জন্য তেমন স্কুল নেই বললেই চলে এখানে। খুললে দারুণ চলবে। তাই রমেশ ওই ইরার দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারে না। বলে রমেশ

—তেমন ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নেই এখানে। ভালোই চলবে। ছাত্র ছাত্রীর অভাব হবে না।

ইরা বলে—তাহলে চালু করবো বলছো ? দরকারী পারমিশন।

রমেশ জানে গোকুলদাস ইশারা করলে সব হয়ে যাবে। তাই রমেশ অভয় দেয়

—ওর জন্য ভাবতে হবে না। ওসব আমিই করে দেব।

ইরা বলে—স্কুল কমিটি একটা নামকোবাস্তে তৈরী করতে হবে। আমি চাই যদুপতিবাবুও থাকুন কমিটিতে। ওই হেডমাস্টার মশায়, নিবারণবাবু ডাক্তায়—

অর্থাৎ সবাই এখানের পুরানো আমলের লোক। রমেশ ভাবছে কথাটা। বলে সে

—ওরা ? ওদের নিয়ে আসবে কমিটিতে ? নতুন কিছু মানুষও উঠছে এখন।

ইরা এখানের খবর অনেক রাখে।

ও বলে ওই গোকুলদাস, বসন্তবাবু ঠিকাদার ওদের নেব, পরে। এখনও এখানের গার্জেনদের বিশ্বাস যোগ্য মানুষ ওরাই। ওদের বাদ দেওয়া যাবে না রমেশ। সেই সময় এখনও আসে নি।

রমেশ চুপ করে যায়। ইরা সেন বলে,

—তবে আসতে দেরী হবে না সেই সময়।

রমেশ নিজেকে সেই আগামী যুগের মানুষদের একজন বলেই ভাবে। ও বিশ্বাস করে পুরোনো এই মানুষগুলো একদিন নিউ বসন্তপুরের বুক থেকে ঝরে যাবে। এদের ঝরিয়ে দিতে হবে দরকার পড়লে। না হলে রমেশ এর মত মানুষদের কেউ স্বীকৃতি দেবে না।

যদুপতিবাবু যতদিন বেঁচে থাকবেন এখানের সবাই জানবে রমেশকে তিনি পথ থেকে কুড়িয়ে এনে নিজের ছেলের মত করেই মানুষ করেছেন।

অর্থাৎ যদুপতি না থাকলে রমেশের কোন অস্তিত্বই থাকতো না এখানে।

যতীনের কথা মনে পড়ে।

এখন সে এখানের একজন কৃতি সন্তান। স্বাধীন একটি সত্তা। তার তুলনায় রমেশ যেন পরগাছাই, যদুপতি নামক মহীরুহকে অবলম্বন করে সে টিকে আছে তার দয়ায়। আর সেদিন সাবিত্রীও তাকে এই কথা বলে চরম অপমান করে সরে গেছে তার থেকে অনেক দূরে। এখন যতীনের সঙ্গেই তার মেলামেশা, ভালোবাসা। রমেশ সেখানে হাত বাড়াতে গিয়ে নিদারুণভাবে অপমানিত হয়েই ফিরে এসেছে।

ইরা বলে—কি এত ভাবছো রমেশ?

রমেশ এই জগতে ফিরে আসে। ইরার চোখে হাসি—যৌবনের ঝিলিক। মনে হয় ওর জীবনে ওর স্বামী ছিল একটা বন্ধন।

আজ সেই বন্ধন মুক্তি ঘটায় ইরা যেন খুশীই।

রমেশ আর এখন আকাশ কুসুমের স্বপ্ন দেখেন। তবু ইরাকে কেন যেন ভালোলাগে তার।

ইরা বলে—তাহলে আসবো কিন্তু রমেশ। স্কুলের ব্যাপারে তোমাকে দরকার হবে!

রমেশ শোনায়—তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমিও খুশী হবো।

রমেশের মনে হয় ইরা এখানেই থাকছে।

তবু তার একটা আসার ঠাই হয়ে রইল' এও যেন রমশের মনে কিছুটা খুশীর ভাব আনে।

দেবেনবাবু এবার নতুন স্কুলের নতুন বিল্ডিং তৈরী নিয়ে বিপদে পড়েছেন, এর আগে স্কুলের অন্য বিল্ডিংগুলো তৈরী করিয়েছিলেন নিজের তদারকিতে।

কিন্তু এবার সরকারী অনুদান আর নিজের চেষ্টায় যে ডোনেশন তুলেছেন তার পরিমাণ কয়েকলক্ষ টাকা, আরও সাহায্য কিছু আসবে প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের কাছ থেকে।

কিন্তু কমিটির চাপে পড়ে কান্তিবাবুকে কনট্রাক্ট দেবার পর থেকেই সমস্যাটা গজিয়ে উঠেছে।

বসন্তবাবুকে বেশী টাকা এ্যাডভান্সও দিতে হয়েছে। কাজ কিছুটা করে তারপর বসন্তবাবু অন্য কোথায় কাজ ধরেছেন, এদিকের কাজ পড়ে আছে টাকা দেওয়া সত্ত্বেও। দেবেনবাবু নিজে চাপ দিতে বসন্তবাবু আবার কিছু গাঁথুনি করে, কিন্তু তাতে সিমেন্টের ভাগ অনেক কম, বালিও নীচু মানের, ইট যা এনেছে সবই জলদাগী।

এই নিয়ে দেবেনবাবু কাজ বন্ধ করিয়ে দেন।

এই নিয়েই সমস্যা বাধে।

আড়ালে বসন্তবাবু বলেন—দেবেনবাবু মোটা টাকা কমিশন

চান, তা দিতে গেলে এইসব মাল দিয়েই কাজ করাতে হবে।

এই নিয়ে সহকারী হেডমাষ্টার বিলাসবাবু, অংকের টিচার নরেশবাবুরাও আলোচনা সুরু করেন। স্কুলে সেদিন কারা পোষ্টারই দেয় দেবেনবাবুর লোভী হাত, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

দেবেনবাবুও বিস্মিত, হতবাক এইসব ব্যাপারে।

এতদিন স্কুলে রয়েছেন নিজের চেষ্টাতে আজ সেই স্কুল গড়েছেন তিল তিল করে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে। তার বিনিময়ে এই যুগে কোন স্বীকৃতিই নাই। আছে ওই স্বার্থান্ধ মানুষ-গুলোর কুশ্রী আক্রমণ।

যদুপতিবাবু এসে নিজের হাতে সেই পোষ্টার ছিড়ে দিয়ে বলেন—মাষ্টারমশাই, ঠিক করেছেন। কাজ বন্ধ থাকবে না। বসন্ত ঠিকাদারের এগেনষ্টে কমপেনসেশন চার্জ করে স্কুল কেস করবে। নিজেরাই আগেকার মত বিল্ডিং তৈরীর কাজ করবো নিজেদের মত করে।

এই নিয়েই নিউ বসন্তপুরের বাতাসে যেন ঝড়ের মেঘ ওঠে।

রমেশও খবরটা শোনে ইরার ওখানে। এখন ইরা সেন বেশ ঘটা করে স্কুল চালু করেছে। গোকুলদাস জিপ নিয়ে এখান ওখানে ঘুরছে ছাত্র ছাত্রীর জন্য।

তার দলের ছেলেরা সাইকেল রিক্সায় মাইক লাগিয়ে সারা সহরের অলিগলি চষে হ্যাণ্ডবিল বিলি করছে ইস্কুলের। ইস্কুল এখন রমরম করে চলছে।

গোকুল এখন সন্ধ্যায় এখানে আসে। আসে ভানু আগরওয়াল।

রমেশ এবার ফাইন্যাল ল' দিয়েছে। এম-এও দেবে।

গোকুল বলে—আইন পাশ করলে বারাসত কোর্টে লেগে যা, মক্কেল আমিই জুটিয়ে দেব। ফৌজদারী দেওয়ানী দুটোই করবি। আর মাঝে মাঝে মিটিংএ যাবি। তারপর দেখছি কি করা যায়।

রমেশ জানে তাকে এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। তারজন্য যা করার তাই করবে সে। ওই সাবিত্রীর সেই কথাগুলো মনে পড়ে। যতীন এখন নামী লোক।

রমেশকেও উপরে উঠতে হবে।

নিউ বসন্তপুরের পুরোনো সব খোলস ফেলে নবাগতরা যেন এই সহরকে জাঁকিয়ে তুলেছে এর বাইরের রূপটাকে।

তেমনি এখানের জীবনে রমেশও একটা ঠাঁই করে নেবেই নিজের।

স্কুলের ওই বসন্তবাবুর ব্যাপার নিয়ে এলাকায় বেশ সাড়া ওঠে।

বসন্তবাবু গোকুলের কাছে গিয়ে হাজির হয়।

—আমাকে তাড়াতে চায় ওই যদুবাবু, দেবেনবাবুরা। ঠিকেদারী করতে দেবে না।

গোকুলের ওই কাজে চারআনা বখরা। বসন্ত এর মধ্যে ওকে হাজার দশেক টাকা প্রণামীও দিয়েছে। আর আমদানী হবে না, গোকুলও গর্জে ওঠে।

—ওই দেবেনবাবুকেই দেখছি।

সেদিন বৈকালে দেবেনবাবু স্কুল থেকে ফিরছেন। এদিকের রাস্তাটা নির্জন। পাশেই খেলার মাঠ। লালু টিমের ক্যাপটেন। ওর দলবল মাঠে খেলার পরও থেকে গেছে।

ওদিকের পথ দিয়ে ফিরছে তারা অন্ধকারে। হঠাৎ দেখে পিনু, বুলুরা হেডমাষ্টার মশায় আসছিল তাকে ধরে বলে—

—বসন্তবাবুর পিছনে লাগবেন না স্যার। ওকে কাজ করতে দেবেন।

দেবেনবাবু বলেন—তোমরা কি বলছ এসব? কমিটি যা বলার বলবে।

বুলু বলে—শুনুন। লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম, বসন্তবাবু কাজ করবে। বেগড়বাই করলে—

পিনু ফস্ করে ইয়া ছোরাটা বের করে হাসছে অদ্ভুত ভঙ্গীতে।

আর সেই সময়ই এসে পড়ে পটল, অন্যরা। ওরা চেনে পিনু, বুলুদের। ওদের হাতে ছোরা আর সামনে হতচকিত হেডস্যারকে দেখে পটলরা এগিয়ে আসে।

—কি হয়েছে স্যার ?

বুলুর ইশারায় পিনু বেগতিক দেখে ছুরিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরে সরে যায়। বুলু বলে

—না। কিছু না।

ওরা চলে যায় তখনকার মত।

দেবেনবাবু বলেন—তোমরা ? এখানে।

ওরাও স্কুলের ছাত্র ছিল। পাশ করে বর্তমানে বেকার।

পটল বলে—খেলার মাঠ থেকে ফিরছিলাম স্যার। ওরা কি বলছিল আপনাকে ছুরি দেখিয়ে ?

দেবেনবাবু অশান্তি চান না। বলেন—না। কিছু না। বাড়ি যাও তোমরা।

একজন বলে—ওরা ঠিকাদারের দালালি করছিল।

দেবেনবাবু বলেন—এ নিয়ে তোমরা কিছু করো না।

চলে আসেন দেবেনবাবু।

কিন্তু ছেলেগুলো দেখেছে ব্যাপারটা। শুনেছেও ওদের কথা।

লালুও এসে পড়ে।

দেবেনবাবুর ছেলে সে। তার বাবাকে ওই গুন্ডার দল শাসাচ্ছিল। লালু এমনিতে ঠান্ডা মাথার ছেলে। দলের নেতৃত্ব দেয় সেইই।

লালু বলে—এখন কিছু করিস না। নিজেরা তৈরী হ। ওই শয়তানের দলকে এবার তাক বুঝে ঘা দিতেই হবে। ওরা ভেবেছে এখানে ওদের জুলুমের রাজত্বই চলবে ?

এবার এই নিউ বসন্তপুরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানের ভাগ্যাকাশেও যেন কালো মেঘ একখানা উঠছে ঝড়ের সংকেত নিয়ে।

বাইরের জীবনে সেটাকে দেখা যায় না।

এখানে এখন ঝকঝকে আধুনিক দোকানপাট, সাজানো রেস্তোরাঁও আছে। আর আছে কিছু ক্লাব-সংস্থা। কিছু ছেলে ইদানীং চাকরি-বাকরি করছে বাবা দাদা মামার ঠেকনোর জোরে। তাদের ঠাট-বাট আলাদা। আর ওর মধ্যে কিছু আছে ব্যাংক-ট্যাংক-এ চাকরি করে। তাদের পোষাকও কেতা দুরন্ত, নটার মধ্যে বাস স্ট্যান্ড-এ এসে খালি বাসগুলোয় রুমাল ব্যাগ বই সারবন্দী ছিটিয়ে রেখে বন্ধুবান্ধব ইয়ার-দোস্তদের জন্য জায়গা রিজার্ভ করে রাখে। সেই বন্ধু অবশ্য তখনও বাড়িতে। এই নিয়ে বয়স্কদের সঙ্গে ঝগড়াও হয়।

কিন্তু একে তরুণ বয়েস, তাই শাঁসালো চকুরি। ওদের মেজাজের সঙ্গে মিইয়ে পড়া বুড়ো কেরানীর দল পেরে ওঠেনা। ফলে ওরা বসে যান—আর বুড়োর দল যায় দাঁড়িয়ে ঠ্যালা খেতে খেতে।

পাড়ায় তারা প্রথম পুরুষ।

এ ছাড়া আছে প্রচুর তরুণ। তারা কোন রকমে থার্ডডিভিশনে পাশ করে মহাপাপের কাজ করার মতই মুখ চুন করে ফেরে। রকে চায়ের দোকান আড্ডা জমায় বেলা দুপুর অবধি।

তারপর দুপুরে বাড়ি ফেরে খিদে লাগলে।

যাহয় চাট্টি খেয়ে এখানে ওখানে তাসের আড্ডা জমায়। তারাই এই সব ক্লাব সংস্থা গড়ে তুলেছে এর-ওর সাহায্যে।

পাড়ায় বারোয়ারী পুজোর উদ্যোক্তা। রাতে চুরি-চামারি হচ্ছে, এদের নিয়েই সভা করে ডিফেন্স পার্টি করতে হয়। পুজোর প্যাণ্ডেলে মনের শূন্যতা, হতাশা চেপে এরাই ধুনো নাচ শুরু করে,

ইদানীং নাচে মিঠুনের নাচ। এই অঞ্চলটা মহানগরের একটা সীমা প্রান্ত।

শহরের সব নর্দমাগুলো নোংরা পচা জল বুকে নিয়ে এখানের একটা খালে এসে পড়ে। এককালে ছিল ফাঁকা মাঠ—হোগলা বন জলা। এখন ঠাঁই না পাওয়া মানুষ এসে এখানেই গড়ে তুলেছে ছোটখাট বাড়ি।

এদের মধ্যে দুচার জন মৌকাবাজও আছে। কোন ফন্দিফিকির করে লোন বের করে নাহয় অন্য ভাবেই রোজগার করা টাকায় বড়সড় বাড়িও করেছে।

কিন্তু বর্ষাকালে প্রায়ই বিপদ ঘটে এখানে। একটু বেশী বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। সারা এলাকা জলে ডুবে যায়। বেশি বৃষ্টি হলে বন্যা শুরু হয়। একতলা বাড়িতে জল ঢোকে, আশপাশের ঝুপড়িগুলো তলিয়ে যায়। তখন ওই গবা, হরিলাল, পটলের দলই ঝাঁপিয়ে পড়ে। লালুরাও এগিয়ে আসে উদ্ধার কাজে। সরকারী লোকেদের দেখা তখন মেলেনা। সাহায্য তখন পেঁছে না।

রাতের অন্ধকারে ওই বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে ডুবন্ত নিরাশ্রয় মানুষ, ছেলে মেয়েদের কলার ভেলায় করে এরাই উদ্ধার করে আনে রেললাইন টপকে শহরের দিকে।

জোরজার করে স্কুল বাড়িগুলোয় তোলে। দরকার পড়লে পাড়ায় বের হয়ে চাল ডাল পুরোনো জামা-কাপড় তোলে এদের দেয়।

সেবার কালীপুজোর বিসর্জন নিয়ে ভবনাথ কলোনীর ছেলেদের সঙ্গে গোলমাল বাধে। ভবনাথ কলোনীর কিছু অন্য ধরনের নামডাক আছে। ওটা একটু দূরে দুটো লাইনের পাশে। ওয়াগন ভর্তি নানা দামী মালপত্র আসে কলকাতার দিকে। কোন্ রন্ধ্র পথে সেই মালগাড়ির কোন্ ওয়াগনে কি দ্রব্য আছে সে খবর এরা বের

করে সেই মত হানা দেয় মালগাড়িতে। ওয়াগন ভেঙে ঠিক মাল রাতারাতি পাচার হয়ে যায় যথাস্থানে। এসব কাজে গোকুলের দল খুব পটু। ভবনাথ কলোনীর কিছু কর্মী যুবকের কাজ এসব। পিনু, বুলুদের নাম অনেকেই চেনে।

তাদের দলই সেবার হানা দিল গান্ধীনগরে। দুচারটে বোমও ফাটল। গর্জন করছে পিনু, বুলু মস্তানের দল। দুচার জন ভদ্রলোককেও শাসায় বাড়াবাড়ি করলে জান খেয়ে দেব। গোকুল এসবে থাকেনা। কিন্তু তার দলবল, পিনুরা তা পারে। ওর দলবল এর কীর্তিকলাপ অনেক। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ওদের পুলিশও কিছু বলে না।

এ হেন নামী ব্যক্তিদের তর্জনগর্জনে পাড়ার নিরীহ ব্যক্তিরা সিটিয়ে যায় ভয়ে। বলে, এসবের কিছু জানি না বাবা।

বুলু মস্তান গর্জে ওঠে

শোন রে বুড়ো ভাম! লাস্ ওয়ার্নিং দিয়ে গেলাম। ওই গবা, ফটিক লালুদের সমঝে দেবে। নাহলে লাস্ গিরিয়ে দেব। হ্যাঁ।

তারপরই কাণ্ডটা বেধে যায়।

গবা ফটিক আরও অনেকেই লালুর নেতৃত্বে পিনু, বুলু মস্তানের বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। সারা পাড়ার বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বোমার শব্দে কেঁপে ওঠে চারিদিক। পাইপগানের গুলি চলছে।

লালু তার দলবল নিয়ে ওই গোকুলের চ্যালাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লালুর দলের রাগটা রয়েছে এদের উপর আগে থেকে।

পিনুর দল ভাবতে পারেনি এ ভাবে তাদের উপর কারা ঘা দেবে। দলের দুচার জন ছিটকে পড়েছে। পিনুর পায়ে লেগেছে বোমার টুকরো।

পিছনে তাড়া করে আসছে লালু-গোবিন্দের দল।

মার শালাদের!

পরাজিত ছত্রভঙ্গ হয়ে পিনুর বাহিনী পালাচ্ছে।

লালু বলে যা. আজ ছেড়ে দিলাম তোদের। ফেব পাড়ায় এসে হামলা করলে ফিরতে হবে না। শালা ওয়াগন তোড়, শিল কাটোয়াদের খতম করে দেব।

ওই পিনুর দল আর এ পাড়ায় হামলা করেনি। তবে খবর আসে প্রায়ই রাতে ওই খালের ধারে মালগাড়ি লুট হয়। গুলি-বোমার শব্দও কানে আসে।

দেবেনবাবু এখানের কাশীনাথ বিদ্যামন্দিরেয় পুরানো শিক্ষক। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে এখানের স্কুলে রয়েছেন। তখন এই এলাকা ছিল প্রায় আধা শহর। খোয়ার রাস্তা, দু'চারটে গ্যাসের আলো জ্বলত এখান ওখানে। চারিদিকে ছিল বাগানবাড়ি। আম-লিচু-নারকেল-এর বাগান আর ছোট বড় পুকুর।

কলকাতার বাবুদের রমরমার সময় এখানে তারা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রাসাদ ভবন করেছিলেন। মহ্ফিল বসত সেই উদ্যানকুঞ্জে। ক্রমশঃ বাবুদের দিন শেষ হবার পর থেকেই সেইসব বাগান-গাছগাছালি জঙ্গলে পরিণত হয়। সন্ধ্যার পর নামে থমথমে নির্জনতা।

দেবেনবাবু সেই আমল থেকেই কাশীনাথ বিদ্যামন্দিরে রয়েছেন। নিজে যেচে যেচে অভিভাবকদের কাছে গিয়ে ছেলেদের এনেছেন স্কুলে। তখন টালি খোলার ছাউনি দেওয়া স্কুল, দেশ বিভাগের পর থেকে এখানে এসেছে মানুষের ভিড়। কলকাতার বহু বনেদী পরিবার-এর একান্নবর্তী সংসার ভেঙেছে। এক বাড়িতে চারটে পরিবার গুঁতোগুঁতি করে থাকার পর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে চারিদিকে। তাদের অনেকেই এসেছে এই অঞ্চলে।

খোয়াঢাকা রাস্তা, দুদিকে খড়ের বাড়ির মানুষরাও ক্রমশ

পাকাবাড়ি তুলেছে আশেপাশের চাপে। কলকাতা শহরের ছোঁয়াটা আরও নিবিড়তর হয়েছে দেশ বিভাগের জন্য।

দেবেনবাবু সেই পরিবর্তনের সাক্ষী।

তাঁর বাড়ির বাইরে বাড়ির জায়গাটুকুতে আগাছার জঙ্গল। একটা পাতকুয়ো, ওদিকে ভাঙা ইঁট-কাঠের স্তূপও রয়ে গেছে। দু'একটা আম-জামরুল গাছ অতীতের সমৃদ্ধির সাক্ষী হয়ে আছে।

বাইরের ঘরের কিছুটা পরিষ্কার করে দেবেনবাবু ওখানে সকাল-সন্ধ্যায় কিছু ছাত্র নিয়ে বসেন। তখন গরীব ছাত্রদের বিনা মাইনেতে পড়াতেন।

আশা ছিল তাঁর ছেলে লালু বড় হবে, বাপের পাশে দাঁড়াবে। আর একমাত্র মেয়েকেও তিনি পড়াবেন। পড়াশোনায় সাবিত্রী ভালই ফল করেছে। সাবিত্রীর পরই ওই লালু।

তবু দেবেনবাবুর সময় খুবই কম।

স্কুলের কাজ বেড়েছে, এখন কাশীনাথ বিদ্যামন্দিরের নিজস্ব তিনতলা বাড়ি হয়েছে। ক্লাশে বেড়েছে সেকশানের সংখ্যা। দেবেনবাবুর স্ত্রী বিজয়া বলে—

দিনরাত স্কুল আর ওই ছেলেদের নিয়েই রয়েছ। নিজের ছেলেমেয়েদের দেখবে কখন? লালু নাকি এক সাবজেক্টে ফেল করেছে।

খেয়াল হয় দেবেনবাবুর। কথাটা ইংরিজির টিচার রামবাবুও বলেছেন।

দেবেনবাবু বলেন,

তাই নাকি! দেখছি। লালু তো দিনরাত খেলা নিয়েই থাকে। ফুটবলেই ওর যত মাথা শুনেছি। তবে সাবিত্রী তো এবার ফার্স্ট হয়েছে।

দেবেনবাবুর স্ত্রী বিজয়া বলে,

মেয়ে তো পরের ঘরে চলে যাবে, সেকি দেখবে তোমায় ? লালুর দিকে নজর দাও !

লালু অবশ্য এসব ভাবনা চিন্তা করে না। স্কুলের ফুটবল টিমের সে ক্যাপ্টেন। খেলার মাঠে তার প্রাধান্য। তার পায়ে বল পড়লে তখন লালুর অন্য মূর্তি। সারা মাঠ কাঁপিয়ে শব্দ ওঠে— বাক্ আপ্ লালু।

লালু তখন সকলের আশা-ভরসার স্থল।

তার স্কুলের টিম-এর নাম সকলেই জানে।

সারা এলাকায় লালু পরিচিত। তাই সেই খ্যাতির পাশে লালুর ওই ফেল করাটা খুব বড় হয়ে ওঠে না। বন্ধু গোবিন্দ বলে,

দেবেনবাবু স্যারের ছেলে হয়ে ফেল করলি ?

লালু বলে ওঠে, তুই কি করলি ?

হাসে গোবিন্দ, আমি তো মার্কামারা রে ! ফেল করবোই।

লালু বলে,

ছাড়তো। চল আজ আগরওয়ালার গদিতে। ক্লাবের জন্য জায়গা তো ম্যানেজ করেছি, এখন টিনের শেড, ধারের পাঁচীল এসব করতে হবে। রমেশদা বলেছে আগরওয়াল. তেলকলের সুশীলবাবু আরও অনেকে কিছু চাঁদাপত্র দেবে। বাজারের নবীনবাবুকেও বলা আছে।

লালুকে পাড়ার কেন আশেপাশের এলাকার মানুষজন সকলেই চেনে। ফর্সা রং, সুন্দর টিকালো নাক মুখ। আর খেলাধুলা-জিমন্যাসটিক করে তাই সুগঠিত দেহ। আর নিজের একটা ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে এর মধ্যে। পাড়ার সকলেই ওই ভদ্র মার্জিত রুচির ছেলেটিকে ভালোবাসে। পাড়ার সব জনহিতকর কাজে ওকে

দেখা যায়। সকলের বিপদে আপদেও এগিয়ে যায় সে। কিশোর-তরুণদের মধ্যে লালু খুবই জনপ্রিয়।

তাই ক্লাবের ব্যাপারে তার এই চেষ্টা কাজে পরিণত হতে চলেছে।

যদুপতি সেন এই এলাকার বহুদিনের বাসিন্দা। তখন স্বদেশী আমলে গান্ধীজীর আদর্শে দীক্ষিত। একটু দূরেই দাশগুপ্ত-মশায়ের খাদি আশ্রম। তিনি গান্ধীজীর গ্রাম সংশোধনের কাজে, খাদির কাজে এখানে আশ্রম গড়েন, যদুপতিবাবু তাঁর সারাক্ষণের সঙ্গী ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে জেল খেটে বের হয়ে এই এলাকায় স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে ছিলেন তিনি

যদুপতিবাবুর এখন বয়স হয়েছে। চোখে ছানি পড়ছে। তবু লাঠি হাতে রিক্সায় চেপে বিভিন্ন এলাকায় যান, রমেশকে নিয়ে।

রমেশ তখন তরুণ। যদুপতিবাবুই তাকে এক রকম পথ থেকে তুলে এনেছিলেন।

তখন সবে দেশবিভাগের ঘা পড়েছে পূর্ববঙ্গের উপর। হাজার হাজার মানুষ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসে ছিটকে পড়েছে শিয়ালদা স্টেশনের আশেপাশে।

যদুপতিবাবু সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ওই সমূহ বিপদে।

কলকাতার উপর মহলের নামী লোক তিনি, দেশের জন্য বহু লড়াই করেছেন, পুলিশের লাঠি খেয়েছেন, জেলবাসও করেছেন বহুবার। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর নিজের জন্য কিছু চাননি। এই এলাকার জীর্ণ একটা বাড়িতে চিরকুমার যদুপতি থেকেছেন, অতি সাধারণ তাঁর জীবনযাত্রা। ভাইরা সকলেই কৃতি। কেউ ব্যবসায়ী। তাদের কাছেও ওঁর কোন দাবী নেই।

যদুবাবু ওই ছিন্নমূল মানুষদের জন্য সরকারকে চাপ দিয়েছেন

তাদের জন্য দাবী করেছেন আহার, আশ্রয়ের। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন।

সেই সময় স্টেশন প্লাটফর্মে দেখেন রমেশকে। একটি কিশোর, দুচোখে তার জল। ছেঁড়া ময়লা পোশাক। দু-একজন শরণার্থী জানায়,

ওর কেউ নাই বাবু। মা-বাবা হক্কলেই মরছে রায়টে। আমাগোর সাথে আইছে ইণ্ডিয়ায়!

অনাথ ছেলেটার কোন আশ্রয় নেই।

যদুপতিবাবু বলেন, আমার সঙ্গে চল। কাজ-কাম করবি, থাকবি।

সেইথেকে রমেশ যদুপতিবাবুর আশ্রয়েই থাকে। যদুপতি-বাবুর ফাই-ফরমাস খাটে, ক্রমশঃ যদুবাবু ওকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। নিজেই ওর বই পত্তর পোশাক যোগান। দেবেনবাবু তখন স্কুলের হেড মাস্টার। তিনিও ওকে ফ্রি করে দেন।

রমেশ পড়াশোনাতে ভালই ফল করে, যদুপতিবাবু বলেন, ভাল করে পাশ কর। তোকে উকিল করে তুলবো। গরীব মানুষ যারা আইনের সাহায্য পায় না, তুই তাদের হয়ে লড়বি।

রমেশকে স্কুলে ভর্তি করে দেন তিনি।

রমেশ ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করতে যদুবাবুই চেষ্টা করে ওকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। বলেন বি-এ পাশ করে ওকালতি পাশ করাবো তোকে। তবে মনে রাখবি রমেশ, গরীবদের জন্য আদালতে লড়বি তুই। পয়সার দিকে নজর দিবি না।

রমেশ কিশোর বয়সের সেই সর্বনাশ, দুঃখ-কষ্টকে ভোলেনি। রমেশ অপরের দয়াতেই মানুষ হতে চলেছে। দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণা সে জানে।

তাই বলে, তাই হবে যদুদা।

যদুপতিবাবু এই অঞ্চলের সকলের দাদা। তাই রমেশও ওকে যদুদা বলেই ডাকে।

সেই রমেশ এখন ওকালতি পাশ করে যদুবাবুর কোন পরিচিত সিনিয়ার উকিলের সঙ্গে কোর্টে বের হচ্ছে। রোজগারও করছে। সেটা পোশাক আশাক দেখলেই বোঝা যায়।

অবশ্য যদুপতিবাবুর পরণে সাবেকী খদ্দরের আধময়লা ধুতি আর পাঞ্জাবী বদলায়নি।

অনেকে বলে, যদুদা! রমেশ তোমার চ্যালা। ওতো খদ্দর পরে না।

যদুপতিদা বলেন, কোর্টে সওয়াল জবাব করতে হয়। গাউন পরে প্যান্ট কোটও পরতে হবে বৈকি। তবে রমেশ সত্যি ভাল ছেলে। গুড বয়।

রমেশ যদুবাবুর কাছে রাজনীতিতেও পাঠ নিয়েছে। এতদিন এইসব এলাকা ছিল কোন মিউনিসিপ্যালিটির আওতায়।

ক'বছরেই এসব এলাকার রূপ বদলেছে। পুরনো বাগান-বাড়ির ধসে পড়া মালিকরাও বেশ মোটা দামে ওই জলা, বনবাদাড় বিক্রী করে দিয়েছে। এখন সেসব জায়গায় বাড়ি উঠেছে, তৈরি হয়েছে নতুন কারখানাও দু'চারটে। কলকাতার সঙ্গে টানা বাসরুট হয়েছে।

আর যেখানে স্টেশনটা এতকাল ঝিমিয়ে থাকতো, সেখানে এখন জনবহুল পরিবেশ গড়ে উঠেছে। বাজারের পরিধি ছিল ছোট্ট, ক্রমশ বাজার দোকানের সীমা বেড়েছে। আর সকাল সন্ধ্যা পথের দুপাশে বাইরের লোকজন তরি-তরকারী নিয়ে বসে বহুদূর অবধি পথ দখল করে।

এই এলাকা তাই এখন চলেছে খাস কলকাতার কর্পোরেশনের

মধ্যে। নতুন ইলেকশনে এবার যদুপতিবাবু রমেশকেই কাউন্সিলার দাঁড় করান।

রমেশও ওকালতির অবসরে রাজনীতি শুরু করেছে। যদুবাবুর জন্য এই এলাকায় তার পরিচিতি। আর নিজেও বলতে কইতে পারে। তাই বিরোধীপক্ষের ক্যাণ্ডিডেটকে সহজেই হারিয়ে রমেশবাবু এখন এখানের কাউন্সিলার হয়েছে।

রমেশের জীবনে এই প্রথম স্বীকৃতি এল।

অবশ্য রমেশের এই জয় সম্ভব হয়েছে ওই যদুপতিবাবুর জন্যই।

রমেশ সেই দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না। সব হারিয়ে পায়ে হেঁটে ট্রেনের কামরার মেজেতে বসে এসে জুটেছিল নাম-পরিচয়হীন একটি কিশোর এই নতুন দেশে।

ক্রমশ আজ সে পায়ের তলে মাটি পেয়েছে, ওকালতি করছে। আজ তাকে নিয়ে সারা এলাকায় বিজয় মিছিল বের হয়েছে।

বাদ্যভাণ্ড সহকারে চলেছে শোভাযাত্রা। ওই পিনু, বুলুর দলও এসে জুটেছে। তাদের দেখা যায় পথের ধারে।

এই যদুপতিবাবুদের দলে তারা যোগ দেয় নি। যদুবাবুও রয়েছেন জিপে। রমেশএর গলায় ফুলের মালা, মাথায় আবীর।

আজ রমেশ যেন আগামী দিনের স্বপ্ন দেখে। ধাপে ধাপে তাকে আরও উপরে উঠতে হবে। এই জনতার ঘাড়ে পা দিয়ে সে আরও বড় হবে।

সেই নাম-পরিচয়হীন ছেলেটা এই মাটিতে মাথা তুলবে বনস্পতির মত।

যতীন ফিরছিল কলেজ থেকে। সাবিত্রীও দোকানে এসেছিল। ওরা দুজনে দেখছে রমেশের ওই বিজয় বাহিনীর শোভাযাত্রা।

রমেশও দেখেছে তাদের।

রমেশের মনে পড়ে সাবিত্রীর সেই আগেকার কথাগুলো। ওকে সাবিত্রীই বলেছিল—

— নাম পরিচয়হীন, পথের মানুষ।

ওই যতীনের দিকেই ঝুঁকেছে সাবিত্রী। রমেশকে কোন পাত্তাই দেয় নি।

আজ রমেশ যেন তাদের সামনে দিয়ে ওই জয়যাত্রায় চলেছে মাথা উঁচু করে বিজয়ী বীরের মত। ওই সাবিত্রী, যতীনদের দেখাতে চায় রমেশ তার জীবনের যাত্রা এই সুরু।

তাকে দমাতে কেউ পারবে না। •

যদুপতিবাবুও জানেন না তিনি এ যুগের জনসেবক তৈরী করতে গিয়ে কি এক নতুন ফ্র্যাঙ্কেনষ্টাইনকে তৈরী করেছেন। রমেশও তা জানতে দিতে চায় না।

যদুবাবু রমেশকে তার অসম্পূর্ণ কাজের ভার দিতে চান। বলেন,

রমেশ নিজের দুঃখকষ্টকে ভুলবি না, সব সময় মনে রাখবি তুই কোথা থেকে এসেছিস। তাই ওই গরীবদের জন্যই তোকে কাজ করতে হবে। এলাকায় হাসপাতাল নেই, কর্পোরেশনকে চাপ দে হাসপাতাল, বিনা মাইনের কর্পোরেশন স্কুল করতে হবে।

রমেশ বলে, দেখছি যদুদা!

লালুদের আজ যদুপতিবাবুর কাছে এসে ক্লাবের কথা বলতে দেখে যদুপতিবাবু বলেন, তোরা রমেশের সঙ্গে কথা বল।

গোবিন্দ বলে, রমেশদা তো ব্যস্ত! তাই আপনার কাছে এসেছি।

যদুপতি বলেন,

সেকি রে? এও তো তার কাজ। ক্লাব, সংস্থা এগুলোকেও

তো দেখতে হবে। ঠিক আছে তোরা সন্ধ্যায় আয়। আমি বলে রাখবো রমেশকে।

যদুপতিবাবু জানেন ওই গোবিন্দ, লালু, পটলের দল রাজনীতি করে না।

তিনি নিজেও চাননা স্কুলের ছেলেরা এই সব রাজনীতিতে আসুক। তাদের এখন পড়ার সময়। তাদের পড়ার ব্যাঘাত করতে চান না।

কিন্তু এর মধ্যে তিনি দেখেছেন রমেশ বাজার এলাকার কিছু ছেলেকে নিয়ে দলের কাজে লাগিয়েছে।

এবার ইলেকশনের সময়ও ওই পিনু, বুলুদের দেখেছেন দলবল নিয়ে প্রসেশন করতে, পোস্টার লাগাতে। এখনও তারা রমেশের সঙ্গে ঘোরে। এটা যদুবাবু পছন্দ করেন না।

যদুপতিবাবু ওই ছেলেদের চেনেন।

বাজারের দোকানদাররাও ওদের সমীহ করে। ওই ছেলের দলই রাস্তার দুদিকে চাষীদের তরি-তরকারী বিক্রী করতে বসায়। ওখানে ঘোরাঘুরি করে, ট্রাফিক পুলিশদের সঙ্গেও গালগল্প করে।

আবার রমেশের এখানেও আসে। এবার কালীপুজোর চাঁদা নিয়ে কি সব গোলমাল, বোমা-বাজিও হয়েছিল ওই ছেলেদের জনাই।

যদুপতিবাবু নিজে গিয়ে সে সব গোলমাল থামান। রমেশকেও বলেন,

ওদের এত মাথায় তুলিস না রমেশ। সৎ কর্মীদের দরকার। ওরা যারা এখানে আসে তাদের মতলব সুবিধার বুঝি না। ওরা তোকে, দলকে এক্সপ্লয়েট করে নিজেদের প্রাধান্য পেতে চায়। ওদের নয় কিছু ভাল ছেলে, ভাল সৎ সংস্থাকে মদত দিবি।

রমেশ চুপ করে শোনে কথাটা। রমেশের ভাল লাগে না।

মনে হয় যদুপতিদার দৃষ্টিটা সাবেকী রয়ে গেছে। আজ সমাজের রূপ বদলাচ্ছে। দেশ বিভাগ, মন্বন্তর সব কিছুর পর সমাজে যে রদবদল আসছে এরা সেটাকে জানতে চায় না। সেই সাবেকী আদর্শ যে বদলে যাচ্ছে এই কঠিন সত্যকে দেখতে পায়নি যদুবাবু!

রমেশ বলে,

অন্যদল ও মাথা তুলছে। এতদিন যে ভাবে রাজনীতি করেছেন আজ সেটা নিয়ে ভাবতে হবে যদুপতিদা। ওই ছেলেদের আমরা কাজে না লাগালে অন্যরা লাগাবে।

বলেন যদুবাবু, খারাপ দিয়ে খারাপ কাজই হয় রমেশ! সমাজের ভাল কিছুই হয় না।

রমেশ চুপ করে যায়। তবে বেশ বুঝেছে যে যদুদার সঙ্গে প্রকাশ্য প্রতিবাদ না করাই ভাল। এখনও তাকে অনেক দূর পথ যেতে হবে নিজের চেষ্টাতেই।

আজ যদুদার কথা শুনে চাইল রমেশ।

একটু আগে পিনু বুলুর দল এসেছিল। আজকাল দলের খরচাও বাড়ছে। কর্মী সংখ্যাও। আসছে আগরওয়ালা, কালু দত্ত, বেণীবাবুরাও।

আগরওয়ালের কারখানার লাইসেন্স করিয়ে দেবে রমেশই। কালু দত্ত এই এলাকার বিরাট ভূষিমালতেলকলের মালিক। ওকে কয়েকটা রেশনের দোকানের পারমিট করিয়েছে। ওদিকের বি-টি রোডের ধারে কোন বাগানের মাঠ ন'কড়া ছ'কড়ায় কিনে দরবারা সিং পেট্রোল পাম্প বানাতে চায়। রমেশবাবুর কাছে সেও আসছে। ইদানীং রমেশের ব্যবহারের জন্য জিপও একটা দিয়ে রেখেছে সিংজী।

যদুপতিবাবু বলেন,

হাসপাতালের কি হল রমেশ? আমি হেলথ মিনিষ্টারকেও

বলে রেখেছি। জায়গাটার কথা হয়েছে। তুমি একটু খবর নাও।

রমেশ চুপ করে যায়।

সেই জায়গাটার দিকেই নজর পড়েছে দরবারা সিং-এর। মোটর গ্যারেজ করবে। তাই জায়গার মালিককে মোটা টাকা দর দিয়েছে, কিন্তু মালিক চান সেখানে হাসপাতাল হোক, সরকারকে কম দামেও তবু দেবে।

রমেশ দরবারা সিং-এর চাপে পড়ে ওই হাসপাতালের ব্যাপারে আর এগোয়নি। ফলে সরকারের ঘরে সেই ফাইল চাপা পড়ে গেছে।

আজ রমেশ যদুবাবুকে চাপ দিতে বলে—আমি দেখছি যদুদা।

যদুপতি বলেন,

দেখছি নয়, বল করছি। এই এলাকার জন্য কিছু কাজ করতে হবে. আর লালুরা এসেছিল ওদের ক্লাবের ব্যাপারে। আমিও বাজার কমিটি থেকে হাজার দুয়েক টাকা দেব বলেছি, সরকার থেকে কিছু ব্যবস্হা করে দাও। না হয় লোক্যাল চাঁদা তুলেও কিছু দাও ওদের। একটা ভাল কাজে লাগবে।

রমেশ ভাবছে কথাটা।

জানে সে ওই লালু, গোবিন্দের দলই সেদিন পিনুদের বাজারের বাইরে সব্জীওয়ালাদের কাছে 'তোলা' তোলার ব্যাপারে বাধা দিয়েছিল, পিনুকা ওখানে দৈনিক বেশ কিছু টাকা তোলে আর রমেশের কাছেও আসে কিছু টাকা, দলের জন্যও কিছু যায়। বাকী নেয় ওই পিনুরা।

এই নিয়মিত রোজগার-এর পথে বাধা দিয়েছে ওই লালুর দল।

রমেশ বলে,

ওই ছেলেরা তো আমাদের কোন কাজ করে না। ওদের ক্লাব গড়ে দিয়ে আমাদের কিছু হবে?

যদুপতিবাবু অবাক হন! বলেন তিনি,

—এ সব কি বলছ রমেশ। আমাদের নীতি সমাজের সেবা করা। নতুন করে দেশকে, সমাজকে গড়ে তোলা। তার বিনিময়ে তো কিছু পাবার আশা করে নয়! তাহলে এতদিন দেশসেবা করলাম, জেল খাটলাম এই ভাবে দিন কাটালাম সব ছেড়ে স্বাধীনতার জন্য। আজ স্বাধীনতা পেতেই সুদে-মূলে তার জন্য দাম চাইতে হবে? কে বলেছিল তোমায় দেশের কাজ করতে? কেউ তো মাথার দিব্যি দেয়নি।

তেমনি যে ছেলে তোমার দলের নয়, কোন ছেলেরা রাজনীতি করে না। সুতরাং তাদের জন্য তোমার করার কিছু নেই। এ কেমন কথা! ওরা আসবে তুমি যা হয় কর।

রমেশের উপর যেন আদেশই দিচ্ছেন যদুবাবু। ব্যাপারটা ভাল লাগে না রমেশেরও। তবু আজ চুপ করে গেল রমেশ।

লালুরাও এসেছে বৈকালে খেলার পর।

রমেশবাবু এর মধ্যে যদুবাবুর বাড়ির দুটো ঘরকে নতুন করে চুন পলেস্তারা করিয়ে রীতিমত অফিস করে তুলেছে। অন্যটায় তার চেম্বার।

যদুবাবু ভিতরের সেই জরাজীর্ণ চুন বালি খসা ঘরেই একটা তক্তপোষে থাকেন, সন্ধ্যার পর আর বের হন না। চোখে ভাল ঠাওর হয় না।

রমেশ ভানু আগরওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে। এমন সময় ওদের ঢুকতে দেখে চাইল। লালু বলে,

যদুদা আপনার কাছে আসতে বল্লেন ক্লাবের ব্যাপারে। রমেশ দেখছে ওদের।

ওদিকে পিনু ততক্ষণে পাশের ঘরে গরম কাটলেট আর কফি এনেছে। কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাই এদের সরাবার জন্য বলে

রমেশবাবু এখন তো বিশেষ কিছু করা যাবে না। সরকারের ঘরে বলেছি, এদিকেও দেখছি যদি কিছু পাওয়া যায়। তোমরা সামনের সপ্তাহে খবর নিও। এখন ব্যস্ত।

পটলা, লালু, গোবিন্দরা ব্যাপারটা বুঝেছে।

তবু গোবিন্দ বলে গত সপ্তাহেই তো বললেন আজ আসতে—

রমেশবাবু চটে উঠলেও সেটা প্রকাশ করে না, বলে সে,

—এত তাড়াতাড়ি কি এসব কাজ হয়? সময় লাগবে।

পটলা বলে, তিরিশহাজার টাকার কালীপুজো করতে সময় লাগে না, ক্লাবের সামান্য কাজে এত সময় লাগে রমেশদা?

ইদানীং বাজার পাড়ায় রমেশ, পিনু, বুলুদের নিয়ে ঘটা করে কালীপুজো করে। ভানু প্রসাদ আগরওয়াল, দরবারা সিং, কালুদত্ত, বসন্ত ঠিকাদাররা ভালো চাঁদা দেয়। রমেশ এখন তাদের ভরসা। ছেলেদের আজকের কথায় রমেশবাবু বলে রাগ চেপে,

তা কি করি বল। একটা কাজ তো নয়। দেখি, পরে এসো!

ওরা বের হয়ে আসে।

বেশ, বুঝেছে লালু এখানে কিছু হবে না।

গোবিন্দ বলে, রমেশদা মুখেই বলবে কাজে কিছুই করবে না তা জানি।

লালু বলে, যেতে দে ওদের কথা। যদুবাবুকেও আর বলে লাভ নেই। যা পারি আমরাই করবো।

লালুরাই পাড়ার লোকজনদের কাছে চেয়েচিন্তে পুরানো টিন কিনে তাদের ব্যায়ামাগার গড়েছে। লালু বলে, মনোতোষদাকে বলেছি, তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ফিজিক্যাল শো দেখাবেন। আমরাও শো করবো। কিছু টাকা তুলতে হবে এই ভাবেই।

পাড়ার আশপাশের অনেকেই এগিয়ে আসেন। শোয়ের টিকিটও ভালই বিক্রী হয়। দেবেনবাবু এ কাজে বাধা দেননি।

তবু তার স্ত্রী বলেন. ছেলেটা এইসব নিয়ে থাকবে, পড়াশোনা করবে না ? তুমিও তাই দেখবে ?

দেবেনবাবু বলেন. এও ভাল কাজ। আর পড়াশোনাও তো করছে।

লালুর বোন সাবিত্রীও বলে দাদাকে,

তোদের কার্ড দিবি। আমিও বিক্রী করে দেব।

সকলের সমবেত চেষ্টায় লালুদের শো দারুণ জমে ওঠে। লালুও নেমেছে ফিজিক্যাল শো দেখাতে। সুন্দর চেহারা, বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ, গলাদিয়ে রডটাকে বাঁকিয়ে দেয়। আলোয় পেশীগুলো চকচক করছে।

মনোতোষবাবুও রয়েছেন। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের খেলা দেখানো হলো করতালির মধ্যে।

অনুষ্ঠানের শেষে হিসাবপত্র করে দেখা যায় প্রায় হাজার দু' আড়াই টাকা বাঁচবে তাদের।

লালু যেন একটা কিছু গড়ে তোলার আনন্দে মত্ত। ওরা নিজেও হাত লাগিয়েছে।

শেডের টিন রং করে নিজেরাই, দু-চারজন তাদের প্যারালাল বার, রিংও দিয়েছে। নিজেরাই, পুরানো টিন দিয়ে মজবুত করে কম্পাউণ্ড ওয়াল তুলেছে। পাড়ার আশপাশের অনেক ছেলেরাও আসে ব্যায়াম করতে।

সামনেই ওদের ক্লাবের ফুটবল মাঠ।

জায়গাটা বেওয়ারিশ পড়েছিল বহুদিন থেকে। মালিকদের বিশেষ পাত্তা নেই। এখন বহু শরিকান হয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। জায়গাটা খাল ডোবা আর ভাঁট, ঘেঁটুবন, কালকাসিন্দে, পুটুস গাছের জঙ্গলে ভরেছিল, ওই লালুই তার দলবল নিয়ে নিজেরা দিনের পর দিন খেটে ঝোপ জঙ্গল কেটে, নিজেরাই ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলে চৌরস করেছে ওই মাঠটা। সেখানেই খেলাধুলো

করে। ওরা পাড়ার বহু ছোট ছেলেমেয়েদের বৈকালে একত্রিত করে ড্রিল, নানা খেলা-ধুলো করায়। কচি-কাঁচারাও সবুজ পরিবেশে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তির স্বাদ পায়। লালু, পটল, গোবিন্দরাই এসবের কর্মকর্তা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ড্রিল, বিভিন্ন এক্সারসাইজ করায়। বৈকালে ফুটবলের মরশুমে ওখানে ফুটবল জমে ওঠে।

ক্লাবঘরটা এখন বেশ ভালই হয়েছে।

যতীন এই এলাকার ছেলে, দেবেনবাবুর ছাত্র। যতীন এখনও মাস্টারমশাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। সে বলে, ইংরাজীতে অনার্স নিয়েছিলাম মাস্টার মশাইয়ের ভরসাতে। তিনিই পড়িয়েছিলেন। তাই ভালভাবে উতরেছিলাম। এম. এ-তেও ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিলাম।

তরুণ যতীন কলকাতার কোন কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। তবু সেও ক্লাবে আসে। লালুদের ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লাইব্রেরীর দায়িত্ব তারই।

দেবেনবাবুর স্ত্রী বিজয়া বলে, লালুর দোষ কি যতীন। তুমিও ওদের দলে ভিড়ে গেছ দেখছি।

সাবিত্রী চায়ের কাপটা যতীনের সামনে দিয়ে বলে, যতীনদা কলেজে ছেলেদের কি করে সামলায় বুঝি না!

যতীন বলে, তাই তো তাদের সঙ্গে মিশে যাই।

দেবেনবাবু বলেন,

তারই দরকার যতীন। ওদের চিনতে হবে, বুঝতে হবে তবেই ওদের মত করে পড়াতে পারবে। আজকাল তারই অভাব। স্কুলে দেখেছি আগে প্রতিটি শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। এখন কেউ কাউকে যেন চিনতে চায় না। ক্লাশে গিয়ে দায়সারা করে পড়িয়ে চলে এলো। তারপর আর যোগাযোগ থাকে না। ফলে একটা ফাঁক-ফারাক গড়ে উঠছে। যাকে বলা যেতে পারে জেনারেশন গ্যাপ। এর ফল কি হবে জানি না।

যতীন শুনছে কথাটা।

বিজয়া বলে, লালুকে মন দিয়ে পড়তে বলো বাপু, সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা। ওই সব খেলাধুলো নিয়েই থাকবে ?

সাবিত্রী যতীনকে দেখছে।

সাবিত্রী বলে, ইংরাজীর নোটগুলো একটু দেখে দিতে হবে যতীনদা।

যতীনের অনেক কাজ।

এলাকার হাসপাতাল গড়ার ব্যাপারে এবার যতীনও এগিয়েছে। তাই নিয়ে ব্যস্ত।

—যতীন বলে,

দু'একদিন একটু ব্যস্ত আছি। আজ পার্কে মিটিং, কাল মিনিস্টারের কাছে ডেপুটেশন, হাসপাতাল হবেই। এখানের লোকজন সবাই সেই চেষ্টা করছে। আমাকেও আসতে হয়েছে।

বৈকাল নামছে। দেবেনবাবু বের হয়েছেন স্কুলে। ছুটির দিনও বৈকালে স্কুলে গিয়ে হিসাবপত্র দেখেন। মেরামতির কাজ চলছে, নিজে গিয়ে তার তদারক করেন। নতুন আর একটা বাড়িও খেলা উঠছে স্কুলের।

বিজয়া বলে, বেশ হয়েছে বাপু! সোনার সংসার, মেয়ে এক-দিকে, কর্তার ধ্যান-জ্ঞান ওই ইস্কুল, ওই তাঁর কাছে সব চেয়ে বড় আর ছেলেও পড়াশোনার পাঠ শিকেয় তুলে দিনরাত ক্লাব আর আর হৈ চৈ নিয়ে ব্যস্ত।

আর বাপ-এর ধ্যান জ্ঞান ওই স্কুল। একবেলা না গেলে পেটের ভাত হজম হবে না। আমার হয়েছে বিপদ। কি যে করি।

তোমরা বসো, দেখি ওদিকে রাতের রান্নার যোগাড় তো করতে হবে।

বৈকাল-এর আলো ম্লান হয়ে আসছে। বাইরের বাড়ির

গাছগাছালিতে আবছা অন্ধকার নামে। বাতাসে ওঠে মাদার-বাতাবিলেবু ফুলের মিষ্টি সুবাস। দু'একটা তারা জেগেছে আকাশে।

সাবিত্রী চুপ করে আছে।

যতীন বলে, ভালভাবে পরীক্ষাটা দিতে হবে সাবিত্রী!

সাবিত্রী বলে, চেষ্টা তো করছি। তুমি কিন্তু চাও না যে আমি ভালভাবে পাশ করি?

হেসে ওঠে যতীন, মাস্টারের সম্বন্ধে এমনি বদনাম দিও না।

সাবিত্রী চাপা অভিমানের সুরে বলে, কি আমার মাস্টার? সপ্তাহে দু'একদিন হাপিত্যেশ করে বসে বসে তবে দেখা মেলে। তাও কিছুক্ষণের জন্য। তাঁর তো রাজ্যের কাজ। পড়াবে কখন?

যতীন বলে, ছাত্রীর পড়ায় মন থাকলে তো?

সাবিত্রী ধমকে ওঠে, পড়ি না? কি বলছো তুমি!

এই সন্ধ্যার মুহূর্তটুকু দুজনের কাছে ক্ষণিকের জন্য কি অমৃত সঞ্চয় আনে।

যতীনও তার বহু কাজের ফাঁকে এই ক্ষণটুকুর জন্য এই সান্নিধ্যটুকুর জন্য এখানে আসে। সাবিত্রীর জীবনে এইটুকু যেন পরম সঞ্চয়। মনে মনে যতীনকে নিয়ে সেও একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখে, জানে না সেই স্বপ্ন কোন দিন সত্য হবে কিনা।

তবু সাবিত্রী নিজেকে যতীনের যোগ্য করার জন্যই তিলে তিলে সাধনা করে চলেছে।

. স্বপ্ন দেখে দেবেনবাবুর স্ত্রী বিজয়াও। তার কাছে সংসারের দৈনন্দিন ঘটনাগুলো বৈচিত্র্যহীন, একঘেঁয়েমি ছাড়া যেন আর কিছুই নয়।

স্বামী দেবেনবাবু আপনভোলা একটি বিচিত্র মানুষ। স্কুল আর ছাত্রদের নিয়েই রয়েছেন। সংসারের দিকে মন নেই।

অথচ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার বিলাসবাবু, থার্ড টিচার গোবর্ধনবাবুরা এর মধ্যে বাড়ি করেছে, সকাল-সন্ধ্যা সেখানে পঁচিশ-তিরিশজন ছাত্র পালা করে পড়ে। বেশ টাকা রোজগার করেন।

তাঁর এক ছেলেকে শিবপুরে ভর্তি করিয়েছেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ভাল ঘরে বরে। গোবর্ধনবাবু, নিতাইবাবু স্যার তো কোচিং ক্লাশ খুলে দু'হাতে পয়সা রোজগার করছে। গুছিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু দেবেনবাবুর বড় বাড়ি তো.হয়নি, নিজের সেই সাবেকী ছোট বাড়িটাই রয়ে গেছে। আর দোতলা তোলা যাই নি।

বহুদিন সে বাড়ির দিকে নজর দেবার সময় সাধ্য হয় নি, এবার মেরামতের অভাবে ধ্বসে পড়বে। অথচ তিনি চালাঘরে থেকে স্কুলের তিনমহলা বিরাট প্রাসাদ গড়েছেন।

নিজের ছেলেকে মানুষ করতে পারেননি, শত শত ছাত্র তাঁর হাত দিয়ে উতরে গিয়ে এখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেবেন-বাবু নিজের জন্য কিছুই করেন নি।

একমাত্র মেয়ের বিয়েও দিতে পারেন নি। সঞ্চয় তেমন কিছুই নেই দেবেনবাবুর।

তাই বিজয়া স্বপ্ন দেখে যদি যতীন দয়া করে তার মেয়েকে ঘরে নেয়, তবু একটু সুসার হবে। রমেশ আর আসে না বড় একটা।

কড়ায় তেল ফুটছে, রাতের রান্না বলতে তরকারী আর রুটি।

বিজয়া ওসব কথা ভাবে না। বেশী ভাবতে গেলে তার মনের অবস্থাও অমনি তপ্ত কড়াই-এর মত হয়ে ওঠে। মনে হয় একদিন ফেটে পড়বে কি অসহ্য উত্তাপে।

স্বামী, ছেলে কাউকে নিয়ে সে সুখী হতে পারেনি।

লালুর সময় নেই। সে তার দল নিয়েই ব্যস্ত।

ক্লাবের শিল্ড ফাইন্যালে তার টিম জিতেছে। কলকাতার কোন নামী দলের সঙ্গে ফাইন্যাল খেলায় লালু সারা এলাকার মুখ রেখেছে। সে একাই দুটো গোল করেছে। যদুপতিবাবু আজ প্রধান অতিথি।

রমেশও এসেছে। কারণ রমেশ ক্রমশ রাজনীতিতে মজা বুঝেছে। কাউন্সিলার থেকে এবার এম-এল-এ হবার স্বপ্ন দেখে। ভোটে জিততে হলে তাই জনসাধারণের সামনে আসতে হবে। কাউন্সিলার-এর সাধ্য সীমিত। তাই এম-এল-এ হতে হবে তাকে।

রমেশ একদিন জীবনে বহু কষ্ট-অপমান-অনাহার সহ্য করেছে, আজ বড় হয়েছে রমেশ, তাই সেই দুঃখ আর অপমানকে ভয় করে।

তাকে আরও বড় হতে হবে। সেইদিনের সমাজ তাকে কিছুই দেয়নি। ভিখারীর মত পথে পথে ঘুরছিল। আজ তার সামনে ভাগ্যের সিঁড়িটা মুক্ত। তাকে ধাপে ধাপে উপরে উঠতে হবে। সেই সমাজকে সে জবাব দেবে ক্রমশ।

কিন্তু রমেশ খুবই সাবধানী এবং কৌশলী। তার মনের এই ভাবটা সে কোন দিনই প্রকাশ করতে চায় না। তাই এসেছে এদের অনুষ্ঠানের গৌরব বাড়াতে।

যদুপতিবাবুও খুব খুশি হয়েছেন এদের খেলায়। লালু তো সারা এলাকার মানুষের আপনজন।

যতীনও রয়েছে। যদুপতিবাবুকে প্রণাম করে যতীন।

যদুপতি বলেন, ভাল তো যতীন। রমেশ যতীনের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে, বড় ভাল ছেলে। কাজের ছেলে। একসঙ্গে কাজ করতে পারলে ভালো হয়।

রমেশও যতীনকে চেনে। একসঙ্গে স্কুলে, কলেজে পড়েছে।

রমেশ জানে যতীনের এখানে পরিচিতি। যুবকমহলে সেও জনপ্রিয়, এই ক্লাবের পান্ডা।

রমেশ বলে, যতীনদাকে চিনি না? কি বলেন যদুদা?

যদুপতি বলেন, একসঙ্গে এই এলাকার মানুষের জন্য কিছু করো। ও তো হাসপাতাল, কো-অপারেটিভ গড়েছে। তুমিও ওর সঙ্গে হাত লাগাও রমেশ!

যতীন চাইল রমেশের দিকে।

যদুপতিবাবুর বয়স হয়েছে। এখন সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি বিশেষ নেই। রমেশই এগিয়ে এসেছে। রমেশ জানে যতীনের কাছে হাসপাতাল সম্বন্ধে রমেশের নীরবতা গোপন নেই।

যতীন মতের বিরুদ্ধেই এ কাজে হাত দিয়েছে, এগিয়েছে। এ যেন রমেশেরই বিরুদ্ধাচরণ করেছে যতীন আর এখানকার কিছু লোক।

তবু রমেশ তার মনের জ্বালাটাকে চেপে রেখে বলে, যতীন তো আমার বন্ধুলোক। একসঙ্গে কাজ করতে আমিও চাই।

যদুপতিবাবু ক্লাব-এর ঘর, ব্যায়ামাগার দেখে বলেন,

—তাহলে রমেশ, তুমি দেখছি এদের জন্য কিছু করছ! খুব খুশি হয়েছি। পাড়ার এইসব সংস্থাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। এদের আরও কিছু সাহায্য কর রমেশ। সত্যিকার ভালো কাজ হবে।

গোবিন্দ পাশেই ছিল।

সে বলে, যদুদা, রমেশদা তো আমাদের জন্য কিছু করেননি। বারকয়েক ঘুরিয়ে শুধু হাতেই ফিরিয়েছেন। এসব আমরা সকলের কাছে ভিক্ষে করে গড়েছি। যতীনদা কিছু ডোনেশান এনে দিয়েছেন। আজও ফাংশানের টিকিট বেচে চার হাজার টাকা বাঁচিয়েছি আমরা। রমেশদা কিছুই করেন নি।

যদুপতিবাবু চাইলেন রমেশের দিকে।

ইদানীং যদুপতিবাবু দেখেছেন রমেশের পরিবর্তনটা। জিপে করে ঘোরে। সঙ্গে থাকে পিনু, রেলপারের মদন, বুলু আরও অনেকে। যাদের সাধারণ মানুষ অন্য চোখে দেখে। আর বেশী

বন্ধুত্ব ওর ভানু আগরওয়াল, আড়তদার, নবীনবাবু, গ্যারেজ মালিক দরবারা সিংদের সঙ্গে।

রমেশ সাধারণ মানুষদের কথা যেন ভুলে যাচ্ছে। সে যদুপতিবাবুর এই অনুরোধও রাখেনি।

রমেশ ব্যাপারটা বুঝে বলে, তখন নানা ঝামেলায় ছিলাম, বিশেষ কিছু করতে পারিনি। এখন দেখছি যদি কিছু করা যায়।

যদুপতিবাবু চুপ করে যান।

অনুষ্ঠানের শেষে রমেশ যদুপতিবাবুকে জিপে ওঠাতে যাবে, বৃদ্ধ মানুষটি বলেন,

ও গাড়িতে যাওয়া আমার হবে না রমেশ। আমি রিক্সায় যাচ্ছি।

গাড়ি ছেড়ে যদুপতিবাবু রিক্সায় উঠলেন। রমেশ জিপে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বুলু, পিনুর দল।

ওরা যেন রমেশের বন্ধু। দরবারা সিং এর জিপটাই এখন রমেশ ব্যবহার করে।

যদুবাবু ইদানীং দেখছেন রমেশ কেমন বদলে যাচ্ছে। অনাথ, পথের সেই অপরিচিত ছেলেটাকে যদুবাবু তুলে এনে পুত্রস্নেহে মানুষ করেছেন। নিজে বহু অভাব কষ্ট সহ্য করেছেন, তবু রমেশকে কোন কষ্ট পেতে দেননি, আজ রমেশ ওকালতি করছে, মন্দ রোজগার করে না। আর ধাপে ধাপে উঠছে।

যদুবাবু ভেবেছিলেন রমেশকে তার আদর্শে মানুষ করবেন। সে হবে সমাজসেবী, নিঃস্বার্থভাবে আর্ত মানুষের সেবা করবে।

কিন্তু ক্ষমতার প্রথম ধাপে উঠেই রমেশ তার নিজের যে স্বরূপ প্রকাশ করতে শুরু করেছে তাতে যদুবাবু শঙ্কিতই হয়েছেন।

স্থানীয় হাসপাতালের জন্য কিছু লোকজন উঠেপড়ে লেগেছে। জায়গাও ঠিক করেছে তারা। কিন্তু ওই জায়গাটার দিকে দরবারা সিং নজর দিয়েছে। মালিককে চাপ দিচ্ছে, রমেশও নাকি চায়

মালিক সস্তাদামে দরবারা সিংকেই জায়গাটা বিক্রী করে দিক। তাতে বোধহয় রমেশের কোন স্বার্থই রয়েছে।

যতীন—অন্যরাও যদুবাবুকে আজ খবরটা দিতে যদুবাবু চমকে ওঠেন। বলেন তিনি,

—সে কি! এলাকার মানুষের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল না হয়ে রমেশ এই চায়?

সে বলে—রমেশদা আরও অনেক কিছু করছেন।

যদুবাবু চুপ করে যান।

তার কাজের সম্বন্ধে আরও খোঁজখবর নিতে হবে যদুবাবুকে। দরকার হলে কড়া কথাই বলবেন রমেশকে। ওই সব মনোবৃত্তি তাকে ছাড়তে হবে।

নেতা সেজে সাধারণ মানুষকে ঠকাবে রমেশ এ তিনি মেনে নেবেন না।

বাড়ি ফেরেন যদুবাবু চিন্তিত মনে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখনও রমেশ ফেরে নি। তার সঙ্গে আজ যদুবাবুর কিছু আলোচনা আছে।

গোবিন্দকে বলেন যদুবাবু—

— রমেশ এলে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিবি।

গোবিন্দ চাকর বলে,

—এখন তো সবে কলির সন্ধ্যে। ত্যানার ফিরতে তো কত রাত হবে কে জানে। আপনি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ুন। খামোকা রাত জাগবেন কেনে! কাল সকালে কতা-বার্তা যা হয় বলবেন! রাতে ওকে কখন পাবেন কে জানে? কত কাজ তার!

গোবিন্দ আরও যেন কিছু ইঙ্গিত করে। যদুবাবু চুপ করে যান।

যদুপতিবাবু ব্যাপারটাকে অন্য চোখেই নেন।

যদুপতিবাবু রাতে একটু দুধ আর খই খান। রমেশের জন্য

চাকরটা খাবার তৈরি করে রাখে। ইদানীং রমেশ নানা মহল্লায় ঘুরে কাজ সেরে বাড়িতে আসে তখন অনেক রাত্রি হয়ে যায়।

ইরা এখানের একটা লেডিজ হোস্টেলের মালিক। ইদানীং কলকাতায় বহু মেয়ে এসে চাকরি-বাকরি করে নানা অফিসে। লেখাপড়া শিখে তারা বিয়েথা করার অবকাশও পায়নি। সংসারের বোঝা বৃদ্ধ বাবা মা, ভাই বোনদের দেখতে হয়। তাই চাকরি নিয়েছে মেয়েরাও।

কিন্তু ছেলেদের থাকার সমস্যার চেয়ে মেয়েদের কাছে এটা আরও বড় হয়ে উঠেছে।

ইরা সেন-এর ব্যবসাবুদ্ধি বেশ প্রখর। তার বাবা এককালে এদিকে সস্তাগণ্ডায় বেশ কয়েক বিঘে জায়গা কিনেছিলেন। তখন ছিল হোগলাবন আর কিছু আম-জাম অন্য গাছের জঙ্গল। ক্রমশ এসব দিকেও জলা ভরাট করে ছোট-বড় বাড়ি উঠতে থাকে। লোকবসতি বাড়ে। জায়গার দামও বাড়তে থাকে।

ইরা সেন-এর স্বামী মারা যান কি একটা অ্যাক্সিডেণ্টে। পাইলট ছিলেন তাই বেশ মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়ে এখানে এসে বড় বাড়িটা তৈরি করায়। চারদিকে কম্পাউণ্ড ওয়াল তুলে বাগানসুদ্ধ করে নেয়।

ওরই একদিকের বাড়িতে গড়ে তুলেছে কর্মরত মেয়েদের জন্য হোস্টেল। আর এপাশে এই হাল-সভ্যতার ছোঁয়া লাগা বাসিন্দাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য একটা ইংলিশ মিডিয়াম কিণ্ডারগার্টেন স্কুল তৈরি করেছে। সেই স্কুল ভালোই চলছে।

ইরা সেন এই এলাকার একটা সমাজে সুপরিচিত নাম। বাগানের একদিকে তার নিজের ছোট্ট বাড়িটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে।

রমেশ এখানে প্রায়ই আসে। আসে মিঃ ভানু আগরওয়াল, নবীনবাবু, কন্ট্রাক্টার বসন্তবাবু।

ইরা সেন আজ একাই রয়েছে।

রমেশকে দেখে বলে, লীডারের পাত্তাই নেই! কি নেবে? চা না কফি? না অন্য কিছু?

ইরা সেন-এর বয়স হয়েছে, কিন্তু বয়সটাকে প্রসাধনে ঢেকে ইরা এখনও তরুণী সেজে থাকে। বব্‌করা চুলগুলো কমনীয় সুডোল ঘাড়ে লুটোপুটি খায়। পরনে সিল্কের শাড়ি, ওর দেহের রেখাগুলো তাতে মুখরতর হয়ে ওঠে। রমেশ চুপ করে বসল সোফায়!

ইরা বলে, এত চুপচাপ যে!

রমেশ বলে, রাজনীতি আর ভাল লাগে না ইরা।

রমেশ আজ যদুপতিবাবুর ব্যবহারে একটু যেন ভাবিত। যদুদা বোধহয় জেনেছিল হাসপাতালের জমিতে বাগড়া দিচ্ছে রমেশ দরবারার জন্যই। রমেশ চিন্তিত।

—তাই নাকি? ইরা চাইল ওর দিকে, বলে সে, হঠাৎ কি হল?

রমেশ বলে,

যদুদা এখনও সেই সদাব্রত চালাতে বলে। আরে বাপু এখন ওসব চলে না। ভাবছি যদুদাকে এবার সেই কথাটাই বলতে হবে। ওঁর হুকুমমত চলতে আর পারব না।

এখন দিন বদলেছে।

ইরা সেন ভাবছে কথাটা। বলে সে, এখুনিই যদুদার মতের বিরুদ্ধে চলবে? যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে যদুবাবু?

রমেশ এখন নিজের পায়ের তলে মাটি পেয়েছে। বলে সে,

যদুদা তো বুড়ো হয়েছে, কবে আছে কবে নেই। দলের কাছে ওর আর দাম কি? আমিই এখন জেলা কমিটির সেক্রেটারী। দরকার হয় ওকে এবার বাতিলই করে দিতে হবে।

হাসছে ইরা সেন।

হাসলে ওর সুন্দর দাঁতে ঝিলিক ওঠে, সারা দেহে কাঁপন জাগে।

বলে ইরা, তাই নাকি! গুরুমারা বিদ্যে শিখে গেছ দেখছি। সাবাস।

রমেশ বলে,

রাজনীতি বড় কঠিন ঠাঁই ইরা। এখানে দুর্বলতার কোন ঠাঁই নেই। তাঁকে শ্রদ্ধা করি তাই বলে সব অন্যায়কে মেনে নিতে হবে?

ইরা দেখছে রমেশকে। ও যেন নতুন মন্ত্রে আজ দীক্ষিত হতে চলেছে।

অবশ্য ইরা সেনও এই মন্ত্রে বিশ্বাসী। বহু বিপদ, ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝে সে এগিয়ে এসেছে এতখানি পথ। সেই পথে অনেকেরই সাহায্য সহযোগিতা নিতে হয়েছে। ইরা তাই সেই বন্ধুদের সঙ্গে মিশেছে ঘনিষ্ঠ ভাবে। মিশেছে কাজ উদ্ধারের জন্য।

তাই কখনও ভানু আগরওয়াল, কখন কন্ট্রাক্টার বসন্তবাবু, কখন নবীনবাবু, শহরের রাজনীতি মহলের দু-চারজন পাণ্ডার সঙ্গেও। কিন্তু ইরার জীবনে তাদের প্রয়োজন ফুরোতেই ইরা সেন সাবধানে তাদের এড়িয়ে গেছে।

আবার এসেছে তার জীবনে নতুন মানুষ। কাউকে সে ভালবাসতে পারেনি, তার কাজ আদায় করে নেবার জন্য ভালবাসার ভান করেছে মাত্র। ইরা তাই রমেশের এই নীতিকে সমর্থন করে মনে মনে। তার বিশ্বাস রমেশ একদিন আরও উপরে উঠবে। তাকে থামাতে কেউ পারবে না। তাই ইরা সেনের তাকেও দরকার। রমেশও চায় ইরাকে।

ইরা বলে, রাত হয়ে গেছে। খেয়ে যাও রমেশ।

রমেশেরও ভাল লাগে ইরার এই সান্নিধ্যটুকু। ওর রুচি, ওর দেহের স্তব্ধ থেমে-থাকা যৌবন রমেশের তরুণ মনে কি সাড়া জাগায়। রমেশ যেন নতুন করে স্বপ্ন দেখে।

ওখানে খেয়েদেয়ে ফিরছে রমেশ। যদুপতিবাবু তখনও জেগে আছেন।

যদুপতিবাবু বিশেষ বের না হলেও তাঁর লোকজন কিছু রয়েছে। তাদের কাছেই সব খবর পান তিনি।

এলাকায় রমেশের কাজের খবরও আসে তাঁর কাছে।

রমেশ ইদানীং কিছু বেআইনী কাজও শুরু করেছে।

আশপাশের অনেক পতিত জলা, হোগলাবন ছিল লাইনের ধারে পাশে। সেখানে এসে বসতির জন্যে হানা দিয়েছে বহু মানুষ। খানা খাল জলা ভরাট করে সেখানে গড়ে উঠেছে দরমা টালি ছাওয়া ঘরগুলো। ওই জবরদখলকারীদের মধ্যে অনেকেই আছেন—আশপাশের এলাকায় ভাড়া থাকতো, চাকরী করছে কোন অপিস কাছারিতে। তাদের অনেকেই রাতারাতি কোন্ মন্ত্রবলে রিফুইজী সেজে গিয়ে ওই সব মুলুকের জায়গাগুলোতেও খুঁটি গেড়ে দখলদারী কায়েম করেছে। অনেকে বাড়িও তুলেছে।

ওই বদনবাবু, হরিহর সরকার, নকুল দে আরও অনেকেই আসে রমেশের কাছে। আর রমেশের দলবলই ওই সব জবরদখলের কাজে সাহায্য করছে। বিনিময়ে নাকি বেশ কিছু টাকাও আসছে রমেশের হাতে।

এ খবর এনেছে অনেকেই!

যদুবাবু খবরটা শুনে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এছাড়া রমেশ বাজারেও কিছু কিছু কাজকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে যেগুলোকে যদুপতি সমর্থন করতে পারেন না।

আর ওই লালুদের ক্লাবকে সে সাহায্য করেনি, তাকে মিথ্যা কথাই বলেছে। ইদানীং যদুপতিবাবু খবর পান রমেশের ওই ইরা সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার খবরও। এগুলোকে সমর্থন করেন না যদুপতিবাবু। ইরা সেন সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনেন।

তাই রমেশকে ফিরতে দেখে ডাকলেন তিনি।

একটু শুনে যাও রমেশ !

রাত্রি হয়েছে।

রমেশ এ সময় যদুপতিবাবুকে জেগে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়। রমেশ যেতেই যদুপতিবাবু বলেন,

এসব কি শুনছি রমেশ ? কলোনীতে বসবাসের জন্য টাকা নিচ্ছ, বাজার থেকে জোর করে তোলা উঠছে তোমার কথায়, এখানে-ওখানে আড্ডা মারতেও যাও। যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করো তারা এখানের মার্কামারা লোক। এসব নিয়ে সমাজের সেবা করা যায় না। ছেলেদের ভাল কাজে এতটুকু সাহায্য করোনি উল্টে মিথ্যা কথা বলেছিলে আমায়! এসব ব্যাপার আমি সহ্য করবো না রমেশ।

রমেশ চাইল লোলচর্ম জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের দিকে। আজ রমেশ এখানে তার পায়ের নীচে মাটি শক্ত করেছে। ওকালতি করেও বেশ আয় হচ্ছে। আর সমাজের কিছু মানুষের স্বার্থান্ধ লোভী রূপটাকে চিনেছে সে। জানে ওদের মদত দিতে পারলে তাদেরই স্বার্থে ওই মানুষগুলো রমেশকে ভোট দেবে, তাকে টিকিয়ে রাখবে।

রমেশকে তারাই পারে এম-এল-এ বানাতে তাদের স্বার্থে। পথের সেই ছেলেটা আজ অনেক কিছু পেতে চায়, আর সেই পাওয়ার জন্য রমেশের সমাজের ওই লোকগুলোকেই দরকার। বৃদ্ধ যদুবাবুর কাছে যা পাবার ছিল তা পেয়ে গেছে। আর কিছু এখানে পাবার নেই। যদুপতি আজ নখদন্তহীন বৃদ্ধ একটা সিংহ। কোন সাধ্য ওর নেই।

রমেশ বলে, আজকের রাজনীতির রূপ বদলে গেছে যদুদা। সমাজও বদলেছে, বদলাচ্ছে।

যদুপতি বলেন,

অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থে রাজনীতি করতে চাও ? আমরা সে

পথে চলিনি। ওই লোভী মানুষদের স্বার্থ আর এলাকার হাজার হাজার মানুষের স্বার্থ এক নয় রমেশ। যদি আমার পথে না চলতে পারো রাজনীতি ছেড়ে দাও। ভণ্ডামি করো না।

রমেশ শোনায়, সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার।

যদুপতিবাবুর কঠিন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—

—না।

তোমাকে আমি পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম, পথের সেই ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি, সমাজের সেবা করতে শিখিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল তুমি আমার মত, পথকে মেনে চলবে। আজ দেখছি স্বভাব যার নীচ—তাকে লেখাপড়া শেখালেও মানুষ করা যায় না। তুমি নেতা হবার অযোগ্য।

এত লোভ তোমার মনে এটা জানতে পারিনি।

রমেশ বলে, এসব কথা আমিও শুনতে চাইনি।

যদুবাবু বলেন, তুমি সেই মত কাজ করেছ। অন্যায় কাজ। যা করা উচিত নয়।

রমেশ আজ মনঃস্থির করে ফেলেছে। আজ সময় এসেছে নিজের পায়ে দাঁড়াবার। ওই অসহায় বৃদ্ধের তিরস্কার সে আর সইবে না।

রমেশ বলে, আপনার মতে যদি এসব কাজ অন্যায় মনে করেন তার দায়িত্ব আপনার।

যদুপতিবাবু রেগে উঠেছেন, বলেন,

তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে আমাকে।

রমেশ বলে, রাজনীতি আপনারা করেছিলেন ভাবের ঘোরে। সেদিন এতটা জটিলতা ছিল না। আজ এসব এসেছে। তাই রাজনীতিতে এসব আসবেই। আর তার জন্য আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আমিই চলে যাব এ বাড়ি থেকে।

যদুপতিবাবু চাইলেন রমেশের দিকে।

বুভুক্ষু ছোট্ট শীর্ণ ছেলেটাকে সেদিন পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। আজ সে বদলে গেছে।

রমেশ বলে, দরকার হয় অন্য পথেই রাজনীতি করব। নিজের বিবেকের নির্দেশে।

যদুপতি বলেন, আর্তকণ্ঠে—

চলে যাবি তুই ?

এ সময় রমেশ আজ সব দুর্বলতা মানবিকতাকে মন থেকে মুছে ফেলেছে নিজের স্বার্থে।

বলে সে, তাই যাব। এখানে আর থাকা যাবে না। ভাবছি কালই চলে যাব।

রমেশ কথাগুলো যদুবাবুর মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল, যদুবাবু চুপ করে দেখছেন নতুন ওই রমেশকে।

সেদিনের পথের ছেলেটা আজ দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে। তার মনে ভালোবাসার কণামাত্র নেই। কর্তব্য তার কাছে দুর্বলতা। এ যেন নতুন এক রমেশ।

এই যুগ এর নতুন ফসল। এরা মানুষকে, সমাজকে, দেশকে কি দেবে তা ভাবতে পারেন না যদুবাবু। নতুন দিন, নতুন যুগের লোভ তার মন থেকে বিবেক ন্যায় কৃতজ্ঞতা মানবিকতা সব কিছুকে নিঃশেষে মুছে ফেলে অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত করেছে।

ওরই মধ্যে বৃদ্ধ যদুপতি শুনেছেন নতুন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন কালের পদধ্বনি, যে যুগ সব কিছুকে দলিত মথিত করে স্বার্থান্ধ মনের সব কার্য পন্থাকেই বর্তমানের নীতি বলে স্বীকৃতি দেবে। পুরনো অতীতের একটি মানুষ আজ তাই অজানা হতাশা আর আতঙ্কে শিউরে উঠেছেন।

ইরা সেন এর কাছেই এসেছে রমেশ। সেদিন রবিবার। ইরার স্কুল আজ বন্ধ। জায়গাটা নির্জন।

ইরা সকালেই রমেশকে আসতে দেখে চাইল। রবিবার এখানে দরবারা সিং, ভানু আগরওয়ালও আসে। অবশ্য বেলাতে এসে জমে তারা।

রমেশকে দেখে ইরা বলে,

— কি ব্যাপার!

ইরাকেই রমেশ জানায়—ওই যদুপতিবাবুর ওখান থেকে চলে যাচ্ছি ইরা।

ইরা ভেবেছিল রমেশকে সরে যেতেই হবে। ইরাও মনে মনে এই চেয়েছিল। আজ সেটা ঘটতে দেখে খুশীই হয়।

ইরা বলে -ভালোই হয়েছে রমেশ। ওখানে ওই মানুষটার দয়ায় কেন পড়ে থাকবে। তোমার নিজের ফ্ল্যাটতো রয়েছে।

রমেশ এর মধ্যে একটা নতুন প্রমোটারকে মদত দিয়েছিল জায়গা পেতে। সেই বসন্তবাবু ঠিকাদারই ওদিকে নতুন ফ্ল্যাট তুলেছে, সেখানেই রমেশের একটা ফ্ল্যাটও আছে।

রমেশ বলে—তাই যাবো।

ইরা বলে—ভালোই হলো। দিনরাত ওই বুড়োটার গার্জেনী কি করে সহ্য করতে জানিনা। এবার নিজের পথেই এগিয়ে যেতে হবে। ফিল্ডওয়ার্ক করো—এম-এল-এ হতেই হবে।

রমেশও তা জানে।

আর তাই এখান থেকেই রমেশকে টাকা রোজগার করতেই হবে যেভাবেই হোক না কেন।

ইরা বলে—গাড়ি দেব, শিফটিং করতে হবে তো?

রমেশ বলে- না, লাগবে না। পিনু, বুলুদের বলেছি। ওরাই সব ব্যবস্থা করে দেবে।

ইরা বলে—তাই ভালো। শিফটিং করো, তারপর একদিন গিয়ে তোমার নতুন ঘর সাজিয়ে দেব।

রমেশ যেন স্বপ্ন দেখছে।

তার শূন্য ঘর একদিন ভরে উঠবে। ইরা সেন সমাজের আজকের দিনের বাঁচার মন্ত্রটা জানে। ওর মদত পেলে রমেশ এর শূন্য জীবন রূপে রসে সার্থকতায় ভরে উঠবে।

রমেশকে পেতে হবে অনেক কিছুই। আজ পথের মানুষটা স্বপ্ন দেখে অনেক কিছু পেয়ে সে সমাজের মাথায় উঠেছে।

রমেশ পরদিন সকালেই চলে যাবার ব্যবস্থা করেছে। অবশ্য রমেশ-এর এখন এখানে জায়গার অভাব নেই। রমেশ বড় রাস্তার ধারে নতুন গড়ে ওঠা হাউসিং স্কিমে একটা থ্রি রুম ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে রেখেছিল আগেই! পিনু, বুলুর দল এর মধ্যে টেম্পো ধরে এনে রমেশের বইপত্র, অন্যান্য জিনিস নিজেরাই তুলেছে।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে রমেশ তার পঁচিশ বছরের পুরনো দুঃখের সংগ্রামের দিনগুলোকে মুছে ফেলে আজ সে নতুন পথে এগিয়ে গেল।

সারা এলাকায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ার আগেই লেবুবাগান মাঠে মহতী জনসভার আয়োজন করেছে রমেশ।

সে আজ ডেকেছে ওই জবরদখল কলোনীর মানুষদের, বাজারের ছোট ফড়ে আনাজওয়ালা—হকারদের। আরও বেশ কিছু মানুষজনও ভিড় করেছে লেবুবাগান মাঠে ওর ভাষণ শুনতে।

অবশ্য এর পিছনে আগরওয়ালার—ঠিকাদার বসন্তবাবুর গোপন অবদানও কম নেই।

প্রকাশ্যে এগিয়ে এসেছে এবার পিনু, বুলুদের দল, তাদের লোকজনও কম নেই। ওরাই চারিপাশের কলোনীর লোকজন, মেয়েছেলেদের এনে জমায়েত করেছে। ভাষণ দিচ্ছে রমেশ।

ওই মানুষগুলোও বুঝেছে এখানে থাকতে গেলে তাদেরও

সুযোগ বুঝে যে কোন দলে হোক যোগ দিতেই হবে। তারা সুযোগ খুঁজছে যে দল ভারি হবে সে দলেই তারা আসবে। যদুপতি না রমেশ কার দলে যাবে তারা।

রমেশ-এর মিটিং-এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও রয়েছে। রমেশ আজ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে এতদিন সে ভুলই করেছিল যদুপতি-বাবুদের পথে রাজনীতি করে। সেখানে গরীব ছিন্নমূল অসহায় শ্রমিকদের কথা কেউ ভাবে না। সেখানে থেকে তবু সেই মানুষদের সেবা করার চেষ্টা করেছিল বলেই আজ যদুপতিবাবু তাকে সহ্য করতে পারেনি।

তাই রমেশবাবু আজ সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করে এই সাধারণ মানুষের মত পথেই নেমেছে, আজ যদুবাবুর সামন্ত-তান্ত্রিক মনোভাবকে সে সহ্য করবে না। সাধারণ নিপীড়িত মানুষদের পাশেই থাকবে সে। তাই যদুবাবুকে ছেড়ে এসেছে। গরীব জনসাধারণের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করার ব্রত নিয়েছেন। আজ থেকে তিনি এই গরীব নিপীড়িত মানুষেরই একজন।

চড়চড় হাততালি পড়ছে।

পিনু-বুলুর দল জানে এবার তাদের দাম বাড়বে রমেশদার কাছে। ওদের কাজ অব্যাহত থাকবে। কর্মক্ষেত্র আরও বাড়াতে পারবে।

সিটি বাজছে তীক্ষ্ন শব্দে। সারা জনতা জয়ধ্বনি করে—রমেশবাবু কি জয়।

রমেশ নতমস্তকে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করছে।

আজ মনে হয় রমেশ একটা ভাল চালই চেলেছে আর যথাসময়ে যদুপতিবাবুকে ছেড়ে এসে ওই দলের উপর একটা কঠিন আঘাত হেনেছে। কে চিৎকার করে ওঠে—যদুপতি মুর্দাবাদ।

রমেশবাবু—জিন্দাবাদ! ওদের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ওঠে লেবুবাগান মাঠে।

যতীন আসছিল কলেজ সেরে। সে থাকে এখান থেকে একটু দূরে। আর রাজনীতির মধ্যে সে থাকে না। হাসপাতালের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। লালুদের ক্লাব, আরও দু-চারটে সংস্থায় যায়।

আজ হঠাৎ রমেশকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওইসব কথা বলতে দেখে আর যদুপতিবাবুর উদ্দেশ্যে মুর্দাবাদ ধ্বনি দিতে দেখে অবাক হয়েছে যতীনও।

সারা মাঠ ভরে গেছে কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে।

আর মিটিংয়ের শান্তিরক্ষার ভার নিয়েছে বুলু, পিনু, রেল-পারের ওয়াগন ব্রেকার শশীর দল। সর্বহারার নেতা হয়ে উঠেছে রমেশ। এতদিন যেন রমেশ সব কিছু ভুলই করে এসেছে। তাই সেই পথ ত্যাগ করে সে সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে এসেছে।

যতীনবাবু একটু অবাক হয় ওর কথায়।

যদুপতিবাবুও মাইকে শুনেছেন ওই সব কথাগুলো। শুনেছেন আকাশ ফাটানো গর্জনে তার নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি।

বৃদ্ধ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। মনে হয় সেদিন শিয়ালদহ প্লাটফর্ম থেকে যাকে তুলে এনে স্নেহ ভালবাসা উজাড় করে মানুষ করেছিলেন, নিজের যোগ্য ছাত্র গড়তে চেয়েছিলেন, সেই-ই যে এভাবে তার প্রতিদান দেবে তা ভাবতে পারেননি। যদুবাবু আজ হেরে গেছেন।

জীবনে যদুপতিবাবুর কোন সঞ্চয় নেই, প্রত্যাশাও নেই। হঠাৎ যতীনকে আসতে দেখে চাইলেন।

—যদুদা! যতীন ব্যাপারটা যেন জানতে এসেছে।

যদুপতি মনের সেই শূন্যতাকে চাপবার চেষ্টা করেন। ওদিকের ঘর দুটোও খালি পড়ে আছে।

পঁচিশ বছর ধরে ওখানে আর একজন বাস করে গেছে, আজ সে

চলে গেছে যদুপতিবাবুকে কঠিন আঘাত দিয়ে। যদবাবু আশা করেনি যে রমেশ তাকে এইভাবে ফেলে চলে যাবে। গোবিন্দ চাকর বলে—তখনই বলেছিলাম।

যদুবাবুর মনে হয় একটা বিরাট ভুল করেছেন তিনি। নিজের বিপদ নয় জনসাধারণের বিপদই যে বাড়বে যদুবাবু অন্তরে সেটা বুঝেছেন।

যতীনকে দেখে সহজ হবার চেষ্টা করে বলেন,

এসো যতীন।

যতীন বলে,

রমেশ চলে গেছে শুনলাম! দেখলাম লেবুবাগান মাঠে কি সব বলছে। এতদিন যেখানে থেকে মানুষ হয়েছে সেখানের জন্য কোন কৃতজ্ঞতাও নেই তার?

যদুপতিবাবু হাসার চেষ্টা করেন।

বলেন তিনি, ওসব কথা যেতে দাও যতীন। তার নিজের চোখ খুলেছে, তাকে জোর করে আটকানো যাবে না। জীবনে আমার সঞ্চয়, পুঁজি কোন দিনই চাইনি। শুধু দিতেই চেয়েছি। বিনিময়ে কোন প্রতিদানই চাইনি। তাই দুঃখ-সুখ-বেদনা আমার কাছে কোন সাড়াই আনেনি যতীন। সে যা ভাল বোঝে করুক। তবে কি জানো? ওর কাছে মানবিকতা-কর্তব্য-ভালবাসার একটু ছোঁয়ার প্রত্যাশা করেছিলাম মাত্র। কিন্তু এ যুগে ওসবের কোন দাম নেই, এটাই দেখলাম যতীন। তাই যদি হয় তাহলে মানুষ কি নিয়ে বাঁচবে বলতে পারো? কিসের আশায় সে ঘর বাঁধবে?

এর জবাবে যতীন বলে,

সব হারায়নি যদুদা, দু'চারজনকে নিয়েই সমাজ নয়, তারাই যে ভুল করেছে এটা একদিন সত্য হয়ে উঠবে তাদের কাছে।

যদুপতি বলেন,

কিন্তু ক্ষতি তখন যা হবার হয়ে যাবে। ওই ভালো-মন্দের সংঘাত যে রক্তক্ষয়ী হবে না, ব্যর্থ হবে না তাই বা কে জানে?

যতীন ভাবছে কথাটা।

আজ সামনে সেই স্বার্থান্ধ মানুষদের হানাহানির ছবিটাই ফুটে ওঠে। একটা শুভ আদর্শ সমাজকে মানুষকে অন্ধকারে ধ্রুবতারার মত পথ দেখায়, কিন্তু সেই আদর্শটুকু যেদিন হারিয়ে যায়, সেদিন তার সামনে নামে বিভ্রান্তির জমাট অন্ধকার, আর সেই অন্ধকার আনে সর্বনাশের সংকেত।

যতীন ওই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে,

একাই থাকবেন নাকি?

যদুপতি হাসলেন। বলেন,

না। বৌমা নিতুরা পাশেই রয়েছে। ওরা দেখবে। আর তোমরা তো আছো যতীন, শেষ সৎকারটুকু নিশ্চয়ই করবে।

যতীন বলে ওঠে, এসব কথা কেন বলছেন?

যদুপতিবাবু বলেন, এখন যাবার কথাই ভাবছি। রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটা মনে পড়ে:

এ যেন মানুষের সব সাধনার কুৎসিত বিদ্রূপই করছে ওরা।

এই বিদ্রূপ, আর সর্বনাশা অবক্ষয়, মানবিকতাকে আজ বিপন্ন করে তুলেছে।

মনে হয় মানুষের সমাজ এগিয়ে চলেছে কি চরম সর্বনাশের দিকেই। শেষ জীবনে এই সর্বনাশ দেখতে হবে ভাবিনি, এ বেদনা, দুঃখ পাবার চেয়ে বোধ হয় এ দুনিয়াথেকে চলে যাওয়াই ভাল যতীন।

যতীনও বুঝেছে ওই অসহায় বৃদ্ধের বেদনাটা। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ভালবাসা, স্নেহকে রাজনীতি আর স্বার্থের কাছে নিঃশেষে বিকিয়ে দিয়েছে রমেশ। আজ তেমনি বিবেক নীতিহীন অকৃতজ্ঞ মানুষ যদি সমাজ সেবায় নামে তারা কি করবে এটাই ভাবার কথা।

যতীন বলে, আজ চলি যদুদা, পরে আসবো।

ক্লান্তস্বরে যদুবাব বলেন,

এসো। তবে সমবেদনা জানিও না যতীন। সেদিন দেশকে, মানুষকে ভালবেসেছিলাম তাই যা ভাল বুঝেছিলাম করেছিলাম। আজ স্বাধীন হয়েছে দেশ, আমাদের কাজ ফুরিয়েছে। এর জন্য কোন দুঃখ আমার নেই। যদি প্রয়োজন বোধ করে মানুষ দেশকে ভালবাসার, তাহলে কর্মীরও অভাব হবে না।

খবরটা সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। যদুবাবু এখানে সম্মানিত ব্যক্তি। আজ রমেশের এই ব্যবহারটা অনেক পুরানো মানুষের মনে প্রশ্ন তুলেছে। চায়ের দোকানে, হরিসভার প্রাঙ্গণে, অবসরভোগী বৃদ্ধদের বৈঠকেই এটা আলোচিত হয় তাদের মধ্যে।

কিন্তু সারা এলাকায় নতুন মানুষ এসেছে অনেক। আশপাশের বিস্তীর্ণ পতিত জমি, জলা ভরাট করে নতুন কলোনী গড়ে উঠেছে, সেখানের হাজার হাজার মানুষ, বাজারের ব্যাপারীর দল-হকার, অন্য কিছু মানুষ যদুবাবুর ইতিহাস, রমেশের অতীত কাহিনীটা জানে না।

রমেশ তাদের কাছে একান্ত নিষ্ঠাবান ত্যাগী কর্মীরূপেই পরিচিত। তাই তারা মানে-জানে।

ভানু আগরওয়ালা, নবীনবাবু, বসন্তবাবু কন্ট্রাক্টার জানেন তাদের লোকজন খাটিয়ে কারখানা চালিয়ে লাভ করতে হবে, সুতরাং রমেশ এখন চমকদার নেতা। ওকে তাদের চাইই। সেই-ই তাদের কাছে পরম বন্ধু।

কিন্তু এর বাইরেও বেশ কিছু মানুষ আছে তারা এই ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখেনি।

লালুদের ক্লাবেও কথাটা আলোচনা হয়।

গোবিন্দ, গুপী, নিতাইরা এ নিয়ে আলোচনা করে। নিতাই বলে,

শালা রমেশটা মিথ্যাবাদী, বেইমান! আমাদের পিছনে লেগে আছে দেখবি কোন দিন বিপদে না ফেলে আমাদের।

ব্যাপারটা সেদিন এরাও বুঝেছিল।

যদুপতিবাবু এদের সামনেই সেদিন রমেশকে বলেছিলেন দু' একটা অপ্রিয় কথা। তার পরই রমেশের যদুপতিবাবুকে ত্যাগ করে ভিন্ন পথে যাওয়ার ব্যাপারটার বোধ হয় কোন যোগও রয়েছে। লালুও ভাবছে একথা।

মনে হয় রমেশ এবার আর ও যে বাড়তে চায়, তাই যদুবাবুকে সে ছেড়ে এসেছে। রমেশের সম্বন্ধে তাদের সাবধান হতে হবে।

গোবিন্দ অনেক খবর রাখে।

বলে সে, রমেশদা বাজারে ওর দলবল নিয়ে তোলা আদায় করে, কলোনীর মানুষদের হয়ে লড়বে বলে পয়সা নেয়! যদুবাবু এটা চাননি।

গুপী বলে, ইদানীং ইরাদির আড্ডাতেও ভিড়েছে। তাই যদুদা ওকে নিষেধ করতেও বের হয়ে গেছে। এবার আর কি করে কে জানে।

লালু বলে, লোকটা বদ! বেইমান!

যতীনদাকে আসতে দেখে ওরা চুপ করে যায়।

যতীনও ওদের আলোচনাটা শুনেছে। তার দু'চারটে সংস্থার ছেলেদের মুখে সে শুনেছে এই কথারই প্রতিধ্বনি। যতীনের মনে হয়েছে রমেশ যদি এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য চালাতে পারে অনেকেরই ক্ষতি হবে। আর এতবড় অন্যায়ের প্রতিবাদ করারও দরকার।

আজ যদুবাবুর মুখেচোখে দেখছে সে অনাগত আতংকের ছায়া। সেই নিষ্ঠুর ভবিতব্যকে তারা ঠেকাবেই, যদুপতিবাবু আজ যদি তাদের সাহায্য পান আবার সত্যিকার কাজ কিছু করতে পারবেন।

যতীনকে দেখে লালু বলে, রমেশবাবু যা-তা বলে মিটিং করছে যতীনদা। সারা এলাকাতে নাকি সবাই বদ্, স্বার্থপর লোক। ত্যাগী-সেবাব্রতী একমাত্র সে। যদুপতিদার মত লোকের নামে মুর্দাবাদ দিতে সাহস করে? এর প্রতিবাদ হবে না?

যতীন ওর স্পষ্ট তেজস্বী কণ্ঠস্বরে একটু অবাক হয়। তবু, বলে, তোরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাসনে। পড়াশোনা কর—

লালু বলে,

এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না যতীনদা, তবু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। ওই যদুদা না থাকলে যে মানুষটা পথেই হারিয়ে যেত, সেই বেইমানকে মাথায় তুলতে হবে?

যতীন ভাবছে কথাটা। বলে, ওসব ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে।

গোবিন্দ বলে,

তাই ভাবো। তবে কিছু করা দরকার। ওরাও যেন আজ প্রতিবাদ জানাতে চায়।

রাত্রি নেমেছে। সাবিত্রী বই খুলে বসে আছে। পড়ায় মন নেই!

দেবেনবাবু আজ স্কুল থেকে সকাল সকাল ফিরেছেন। তাঁর মন-মেজাজও ভাল নেই। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মিটিং সামনে, তার পরই নতুন ইলেকশান হবে।

যদুপতিবাবুই বর্তমানে স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট, আগরওয়াল, ইরাদেবী আরও কয়েকজন মেম্বার আছেন। পরেশ, বিলাসবাবুদের স্কুলে এনেছিলেন দেবেনবাবুই। বিপদে পড়েছিলেন ওরা।

বিলাস, পরেশবাবু স্কুল কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি হয়ে রয়েছেন। তাঁরাই কিছুদিন ধরে দল পাকাচ্ছেন।

দেবেনবাবু তাদের সময়মত স্কুলে আসতে বলেন, ক্লাস নিতে বাধা দেন এর জন্য ওদের কোচিং ক্লাস করতে অসুবিধা হয়, স্কুলের

বিল্ডিং এর কাজ দেখেন দেবেনবাবু তাই তারা খরচা-পত্রের হিসাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। স্কুলের তিনতলা বিল্ডিং করার বিপক্ষেই কথা বলেছেন। কারণ বিলাসবাবুর ভাইপোকে বিল্ডিং এর ঠিকা দেওয়া হয়নি।

দেবেনবাবু দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে স্কুল চালিয়েছেন, এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হননি।

তাই বলেন, হিসেবপত্র সব দেখে নিতে পারেন। আজ কন্ট্রাক্ট না দিয়ে নিজেরা করেছি, কিছু পয়সা তো বেঁচেছে।

বিলাসবাবু বলেন, বেঁচেছে না বেশী খর্চা হয়েছে তার প্রমাণ কি?

দেবেনবাবু বিস্মিত চাউনিতে দেখছেন ওদের। আহত কণ্ঠে বলেন তিনি, অবিশ্বাস করছেন আপনারা?

পরেশবাবু বলেন, না, তা নয় মাস্টারমশাই! তবে এ প্রশ্নও তো উঠতে পারে। তাই আলোচনা করছি।

দেবেনবাবু জবাব দেন না।

তবে বেশ বুঝেছেন এ যেন একটা আগামী ঝড়ের প্রস্তুতিই চলেছে। এটা তিনিও আশা করেননি। কিন্তু রমেশের ওই ব্যাপারের খবর শুনে মনে হয় একটা কালো হাত শক্ত হয়ে এগিয়ে আসছে এতদিনের গড়ে ওঠা বিশ্বাস নীতির ভিত্তিমূলে ঘা দেবার জন্য। চুপ করে বাড়ি ফিরে বসে আছেন দেবেনবাবু।

বিজয়াদেবী স্বামীকে সকাল সকাল ফিরতে দেখে একটু অবাক হয়।

বলে সে কি গো চুপচাপ বসে আছো যে? শরীর-টরীর খারাপ নাকি?

দেবেনবাবু বাইরের কাজকর্মের ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ আলোচনা করেননি এতদিন। বিজয়াও সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

আজ দেবেনবাবু বলেন, স্কুলে যাদের আমি নিজের হাতে কাজে এনে ছিলাম আজ তারাই অশান্তি করতে চায় বড়বৌ। এসব আর ভাল লাগছে না। মন-মেজাজ বিষিয়ে গেছে।

বিজয়া দেখছে দেবেনবাবুকে। ক্লান্ত স্বরে বলেন দেবেনবাবু -- ছেলেপুলেরা পাশে দাঁড়ালে এই সব এবার ছেড়ে দিতাম বড়বৌ! আর ভালো লাগছে না।

কিন্তু সে আশাও সুদূর পরাহত। এখন দিন চালাবার জন্যও তাঁকে এ বোঝা টানতে হবে মান-অপমান সহ্য করেও।

মেয়েটারও বিয়ে থা দিতে পারেন নি। একমাত্র ছেলেও মানুষ হল না এখনও। দেবেনবাবু এবার ভাবছেন।

ভাবনাগুলো মনের আকাশে ভিড় করে আসে। চুপচাপ বসে বসে আছেন, বাইরের বাড়িতে সাবিত্রী পড়ছিল, যতীনকে ঢুকতে দেখে চাইল।

বলে সে, এসো যতীন দা।

যতীন এসেছে আজ দেবেনবাবুর কাছেই।

রমেশের ওই ব্যাপারটা সারা এলাকার ঝড় তুলেছে। আজ যেন রমেশ সরকার প্রকাশ্যে সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চায়। স্কুলের খবরও পেয়েছে যতীন।

সেখানেও ঢুকতে চায়, রমেশ। আর বিলাস, পরেশবাবুদেরও দেখা যায় তার নতুন ফ্ল্যাটে ঘনঘন যেতে।

বোধ হয় স্কুল কমিটির মিটিং-এর জন্য গোপন প্রস্তুতিও চলেছে এই ভাবে তাই ব্যাপারটা জানার জন্য এসেছে সে। যতীন বলে, মাস্টারমশাই আছেন সাবিত্রী?

দেবেনবাবু ও যেন যতীনকে প্রত্যাশা করেছিলেন। ওর গলার স্বর শুনে ওপাশের ঘর থেকে বলেন,— ভিতরে এসো যতীন।

যতীনও সন্ধ্যাবেলায় আজ ওঁকে বাড়ি ফিরে আসতে দেখে কিছুটা আঁচ করে নিয়েছে দেবেনবাবুর মনের অবস্থাটা!

দেবেনবাবু সব কথাই জানান। আজ মনে তাঁর একটা নিবিড় বেদনাই জমেছে। বলেন তিনি, ওই বিলাস, পরেশদের আমিই স্কুলে এনেছিলাম।

যতীন বলে,

আজ তারা স্বমূর্তি ধরেছে। এই হয় মাস্টারমশাই। এর পিছনেও মনে হয় রমেশবাবুরও হাত আছে।

দেবেনবাবু অবাক হন,

কি বলছ যতীন? রমেশ আমার ছাত্র,

যতীন দেখছে দেবেনবাবুকে। যদুপতিবাবুর কথা মনে পড়ে। ওই বৃদ্ধও সারা জীবন ধরে সমাজের সেবা করে এসে আজ ঠকেছে নতুন সমাজের মানুষের কাছে। ন্যায় নীতি বিবেক মূল্যবোধ সবই আজ হারিয়ে গেছে। এরা তারই জন্য দুঃখ পাবেই।

যতীন বলে—ছাত্ররাও আজ বদলে গেছে মাস্টারমশাই। ওরা চায় সব কিছু দখল করতে। তার জন্য যা করার দরকার তাই করবে।

দেবেন বাবু দেখছেন যতীনকে।

আজ বৃদ্ধ দেবেনবাবুর মনে হয় এতদিনের আকাশে তিল তিল করে নৈরাশ্য, হতাশা, স্বার্থপরতার মেঘ জমেছিল। আজ সেটা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে হয় বজ্রাঘাত—ধ্বংস নেমে আসবে।

দেবেনবাবু তবু বলেন,

এত বিপদ, দেশ ভাগ, দাঙ্গা-মন্বন্তর পার হয়েছি, তবু সব কিছু ভেঙে পড়েনি যতীন, এত অশুভের মাঝেও সব কিছু টিঁকেছিল।

যতীন বলে,

কিন্তু দেশ বিভাগের আসল সমস্যাটা শুরু হবে পরে। তখন যদি পঁচিশ লক্ষ মানুষ এসেছিল, পরে তো সেই সংখ্যাটা আর

তিনগুণ-চারগুণ বাড়ছে, তার উপর বাইরের চাপও তো বাড়ছে। ফলে সমস্যাও জটিলতর হচ্ছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে লোভ। অর্থের, প্রতিষ্ঠার লোভ। তাই মানুষ আজ বদলে গেছে মাস্টারমশাই। বাঁচার লড়াই যত তীব্র হবে ততই বিবেক, মনুষ্যত্ব, ন্যায়কে হারাবে মানুষ।

দেবেনবাবু চুপ করে ভাবছেন কথাগুলো। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এমনি জটিলতার আবর্তে পড়তে হবে তা ভাবেননি। সামনে আজ কোন পথই নেই।

কোন আদর্শও নেই। নেই কোন সত্যকার সর্বত্যাগী নেতা—যিনি দিশাহারা মানুষকে পথ দেখাবেন।

দেবেনবাবুর সামনে অতল আঁধার ঘনিয়ে আসে।

যতীন বলে,

তবু বাঁচার জন্য লড়তে হবে মাস্টারমশাই, কিছু লোক চিরকালই থাকবে যারা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমাজের সুস্থ ধারাটাকে বজায় রাখবেই।

দেবেনবাবু আশা ভরে চাইলেন।

বলেন তিনি, জানি না যতীন। মনে হয় এই আঁধারে যেন সব কিছুই আমাদের হারিয়ে যাবে।

যতীন ওই যদুপতিবাবু দেবেনবাবুদের কাছে আজ কোন আশ্বাস দিতে পারে না। তবু মনে হয় এ বিষয়ে তারও করাব কিছু আছে। একটা নৈতিক সামাজিক দায় তার রয়ে গেছে। এটাকে সেও আজ অস্বীকার করতে পারে না। ভাবছে যতীন কথাটা।

যতীন বলে,

আজ চলি মাস্টারমশায়, পরে কথা হবে। দেবেনবাবু বলেন, এসো বাবা। দেখা যাক ওদের ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়ায়!

সাবিত্রী চুপ করে বসেছিল, ওদের কথাবার্তা কিছুটা সেও শুনেছে। রমেশবাবুকেও চেনে সাবিত্রী, আর তার ওই ইরাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথাও জানে।

ইরাদির সম্বন্ধে এখানে অনেক কথাই ছড়িয়ে আছে। তার সত্য মিথ্যা ঠিক জানে না সাবিত্রী। তবু দেখছে ইরাদি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে, এখানের সমাজে তার প্রতিষ্ঠাও আছে।

রমেশ তার ওখানেও যায়। দেখেছে দরবারা সিং-এর জিপ হাঁকিয়ে চলে রমেশবাবু, মাঝে মাঝে কলোনী-ঝুপড়ি-বস্তি-গুলোতেও যায় পায়ে হেঁটে।

তখন তার অন্য রূপ। সেই লোকটিই যেন আজ ঝড় তুলেছে।

যতীনকে দেখে সাবিত্রী চাইল। তারও পড়ায় মন বসেনি।

সাবিত্রী বলে, চলে যাচ্ছো ?

যতীন দাঁড়াল। এগিয়ে আসে সাবিত্রী। শুধোয় সে, কি যে বলছিলে বাবাকে ?

যতীন ওই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্য বলে,

ওসব শুনে তোমার কি হবে ? সামনে পরীক্ষা সেই কথাই ভাব। পড়াশোনা কর ঠিকমত।

সাবিত্রী চুপ করে গেল। মনে হয় যতীনও আজ তাকে এড়িয়ে গেল।

অভিমান ভরে সাবিত্রী বলে, ওসব ঠিকই করছি! ভালভাবে পাশ করার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না।

ফিরে গিয়ে সাবিত্রী বই-খাতা তুলে ভিতরে চলে গেল।

যতীন দেখছে ওকে।

রমেশ যদুবাবুর আশ্রয় ছেড়ে আসার পর আবার হিসাব করেই পা ফেলছে।

জানে রমেশ ইরা সেন তাকে পছন্দ করে।

মহিলার ক্ষমতা আছে। ভরা যৌবন আর কাজ করার প্রচণ্ড মানসিকতা তার আছে। কলকাতার সমাজের উঁচু তলাতেও তার মেলামেশা।

রমেশ তাই ইরার এখানে আসে।

ইরাও জানে রমেশেরও তাকে দরকার। মেয়ে হয়ে পুরুষের মনের অতলের এই ব্যাকুলতাকে সে চেনে। তারও একজন পাশে চাই।

ভানু আগরওয়াল, দরবারা সিংদের কাজে লাগানো যায়, তাদের সঙ্গে মেলামেশাটা তত গভীর করা যায় না।

তাই ইরা রমেশকে কিছুটা প্রশ্রয়ও দেয়।

ইরা জানে রমেশকে এম-এল-এ করতে পারলে এখানে সে গার্লস হাইস্কুল করতে পারবে। আর স্কুলের ব্যবসায়ে এখন যে ভালো আমদানী হয় তাও বুঝছে ইরা।

নিজেও এখানে মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেছে, নিজের প্রতিষ্ঠা কায়েম করার জন্যই।

রমেশ সেদিন সন্ধ্যায় ইরাকে বলে,

—এখন ওই বুড়ো যদুবাবু নাকি আমার পিছনে লাগতে চায়, যতীনকে নাকি কি সব বলেছে, ওকেই নাকি আমার এপাশেই দাঁড় করাতে চায়।

ইরা বলে—ঘাবড়ে গেলে নাকি রমেশ?

রমেশ জবাব দেয়—এত সহজে ঘাবড়াইনা আমি। আমি এবার ফনীবাবুর দলের সঙ্গেই হাত মেলাচ্ছি। ওরাও কথা দিয়েছে আমি তাদের দলে গেলে ওরা আমাকেই তাদের দলের ক্যানডিডেট করবে, ওরা আমার হয়ে কাজ করবে।

ইরা জানে ফণীবাবুদের। যদুপতিবাবুদের প্রতিপক্ষ ওরা। ওর দলও এখানে মাথা তুলছে।

ইরা বলে—তাহলে ভালোই হয় রমেশ।

রমেশ বলে—ইরা, ওরা যে যা করে করুক। তোমাকে পাশে চাই। তুমি পাশে থাকলে কেউ আমাকে হারাতে পারবে না। আখেরে তোমারও লাভ হবে। ইরা মনেমনে লাভক্ষতির হিসাবটা করে নিয়ে বলে।

—তোমার পাশে থাকবোই রমেশ। জানি তুমি উপরে উঠবেই। ইরা দেখছে রমেশকে।

ফণীবাবুরা এতদিন এই এলাকায় সুবিধা করতে পারেনি। তার দলে তেমন কেউ ভাল বলিয়ে করিয়েও ছিল না। আজ ফণীবাবু রমেশের যদুপতিকে ত্যাগ করার খবর পেয়েই ছুটে এসেছে।

রমেশের ফ্ল্যাটটা বেশ ছিমছামই। জিনিসপত্র তখনও গোছানো হয়নি।

পিনু-বুলু-রুণুদের দল এবার এখানেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। যদুপতিবাবুর বাড়িতে তেমন ঠাঁই ছিল না তাদের। বুড়োকে তারাও এড়িয়ে চলত। এখানে সে বাধা নেই।

ফণীবাবু এসেছে।

বলে সে, এবার নতুন উদ্যমে কাজে লাগো রমেশ. এতদিন যে কি করে ওই বুড়োকে সহ্য করেছিলে কে জানে? ও তো আগরওয়াল, নবীনবাবুদের দালাল। আর নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গিও নেই! চরকা কেটে আর জেল খেটে নাকি ওরা স্বাধীনতা এনেছে।

রমেশ বলে, ভাবছি এবার এই এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করব।

ফণীবাবুর দল এর মধ্যে কাজে নেমেছে।

পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তুলে রিলিফের কাজও করে। আর কলোনীর লোকদের পাশে দাঁড়িয়ে দু'চার কথা বল্লেই সেই অসহায় মানুষজন তাদের আপনজন বলে ভাবে। ওদের মত বঞ্চিত, রাজনীতির দাবাখেলার ঘুটিদের হাতে আনা খুবই সহজ, তাই ফণীবাবুর দল সেখানেও নাক গলিয়েছে।

এবার ফণীবাবু রমেশকে বলে,

তোমার পাশে আমরা আছি রমেশ, ভোটে তোমার জন্য আমরা খাটব। আমাদের নীতি আর পথ এক।

রমেশের এখন একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার।

চতুর রমেশ জানে যদুপতির দল থেকে হয়তো বাধা আসবেই। তাই তাকে একটা দলে আসতে হবে। রমেশ ফণীবাবুকে হাতে রাখতে চায়। সে জানে কিভাবে কাজ উদ্ধার করতে হবে।

রমেশ বলে, ঠিক আছে ফণীদা, যদি মতে মেলে একসঙ্গে কাজ নিশ্চয়ই করব।

ফণীদা বলে,

তাহলে একবার বসে সব আলোচনা করে নিই। ক্রমশ এখানের হাসপাতাল, স্কুল-এর কাজও হাতে নিতে হবে। ওইসব ঘুঘুর বাসা এবার ভাঙব।

রমেশও কথাটা ভাবছিল।

যদুপতিবাবুদের প্রতিষ্ঠা এবার সে মুছে দেবে। আর রমেশ জানে, সে এই যুদ্ধে জয়ী হবেই।

রমেশ বলে, এতদিন ওরাই যেন এখানের সবকিছু ছিল। এবার দিন বদলাবেই।

বুলু-পিনুর দলও তাই চায়। এবার তাদের বাধা দেবার আর কেউ নেই। যদুপতিবাবুর শাসন করার কোন অধিকার নেই তাদের। ক্রমশঃ ওই বুলু-পিনুরা দেখছে এখন জোর যার মুলুক তার। পুলিশও কিছু প্রণামী পেলে নীরব থাকে।

কারণ প্রণামীটা মাসে মাসে নিয়মিত আসুক এই চায় তারা। তাদের কিছু দিয়েও বুলুদের ভালই থাকে। টাকার লোভে বেশ কিছু ছেলেকে দলে টেনেছে।

স্টেশনের রূপলাল এর ওদিকের ঝুপড়িতে এখন চোলাই মদের

ঠেক পুরোদমে চালু করেছে। রমেশদার জন্য টাকার দরকার। রাতের অন্ধকারে মদ বেচে ভালো আয় হয়।

স্টেশনের বাইরে বাজার। তখন লোকজন বেশী ছিল না এখানে, বাজারের বিরাট চালাটা তার তুলনাতে শূন্য বলেই মনে হত।

ওদিকে আলাদা শেড-এর নীচে মাছের বাজার বসে। এখন এই এলাকার লোকসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। ফলে সেই বাজারে আর কুলোয় না।

বাইরের কয়েকশো চাষী-ফড়ে এখন বাজারের বাইরের চারিদিকেই রাস্তার ধারে তরিতরকারী-আনাজপত্র নিয়ে বসে যায়, আর তাদের সীমানাও বাড়ছে। পুলিশও বাধা দেয়। বাধা দেয় রাস্তার ধারের দোকানদাররা। তাদের কেনা-বেচার খুবই অসুবিধা হয়। গোলমালও বাধে। বাজারের বাধা দোকানদারদের অসুবিধা হয়। দোকানদাররা কিছু লোকজন মিলে আজ ওদের তুলে দিতে চায়। ফড়ে-চাষীরাও ছাড়বে না।

এমন সময় আসয়ে অবতীর্ণ হল বুলু পিনুর দল। ওদের মধ্যে সোরগোল ওঠে। দূরে এদিক ওদিক কলরব ওঠে।

বুলু গর্জায়, এই গরীব চাষীদের রুজিরোজগারে বাধা দিলে তাদের বোম মেরে হটিয়ে দেবে।

পিনু হুঙ্কার ছাড়ে, লাশ গিরিয়ে দেব, যে শালা এগোবে। ওরা তৈরী হয়ে পজিশন নেয়। এদের সকলেই চেনে।

ওয়াগন ভেঙে মাল পাচার করে, রূপলালের ঠেকে চুল্লু খেয়ে সকালেই এরা তৈরি হয়ে এসেছে।

দু একটা বোম-এর শব্দ ওঠে। দোকানদাররা জানে এদের চটিয়ে তাদের ব্যবসাপত্র চলবে না। তাই এরাও চুপ করে যায় তারা বুলুদের ভয়েই।

রমেশ সরকারও আশপাশেই ছিল।

এবার তার দলের ছেলে নিয়ে রমেশ এসে পড়েছে। একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে সে তারস্বরে লেকচার দেয়,

এদেরও বাঁচতে দিতে হবে। এদেরও বাঁচার অধিকার আছে। ভাইসব—চড় চড় শব্দে হাততালি পড়ে।

রমেশ বলে চলেছে—দোকানদারদের দোকানে যাতায়াতের পথ ছেড়ে রেখে বাকী জায়গায় আপনারা বসুন। শান্তিপূর্ণ ভাবে বেচা-কেনা করুন। তার তদারকির জন্য আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা থাকবে। তাদের সাহায্য নিন। কে বলে, পুলিশ রাস্তা বন্ধ করেছি বলে বাধা দিতে আসে।

রমেশ বলে, তার প্রতিকারও করবো। জনসাধারণকে জানাবো এইটুকু অসুবিধা সইতে হবে।

বুলু, পিনুর দলের ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে গেল। তারা এখানে-ওখানে ঘুরে চাষীদের কাছে এবার অলিখিত নির্দেশে তোলা তুলতে থাকে, তার পরিমাণও কম নয়। রমেশের দলের ফাণ্ডেও দিতে হয় কিছু টাকা। বাকীটা থাকে বুলু, পিনুদের তার পরিমাণও কম নয়। দিনান্তে কয়েকশো টাকাই আসছে ওই ব্ল্যাকারদের হাতে।

রমেশবাবু ওদের কিছু দিয়ে তার থেকে অন্যখাতে কিছু খরচা করে থাকে। বাকীটা থাকে দলের নামে। আর বিচিত্র কারণে পুলিশ এই রাস্তা বন্ধ করে বেচা-কেনার ব্যাপারটা দেখেও দেখে না। ফণীবাবুও আমদানীতে খুশি। ফণীবাবু ব্যাপারটা দেখে বলেন রমেশকে,

দারুণ একটা কাজ করেছ রমেশ। আহা গরীব চাষী-ফড়েদের বাঁচার পথ করেছ। এইতো প্রকৃত সমাজ সেবা।

গলা নামিয়ে বলে, আর দলের কিছু আমদানীও হচ্ছে। রমেশ বলে তারও দরকার। দলের একটা বাড়ি করতে হবে ফণীদা।

ফণীবাবু বলে, দারুণ হবে তাহলে।

এবার তারাই এই এলাকার সবকিছু দখল কায়েম করার চেষ্টা করছে।

সবদিকেই থাবা বসাতে চায় রমেশ। স্কুলের মিটিংয়ে সেদিন ঝড় বয়ে যায়। রমেশ সরকার কমিটি মেম্বার।

যদুপতিবাবু প্রেসিডেন্ট।

দেবেনবাবু স্কুলের কাগজপত্র, আয়-ব্যয়ের হিসাব কমিটিতে পেশ করতেই বোমা ফাটার মত গর্জন করে ওঠে পরেশ বাবু!

—ওসব দু নম্বরী হিসাব। ভাল করে দেখুন ওতে অনেক কারচুপি আছে।

দেবেনবাবু ছত্রিশ বছর ধরে স্কুল চালিয়ে এসেছেন। সেদিনের টালি-খোলার ঘর থেকে আজ দেবেনবাবুর চেষ্টাতেই সেখানে তিনতলা পাকা বিরাট বাড়ি উঠেছে। কম্পাউন্ড ওয়াল ঘিরে ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ হয়েছে। খেলাধুলো, পড়াশোনায় ইতিমধ্যে এই স্কুল এই এলাকায় সুনাম কিনেছে। তাই ছাত্র-ছাত্রী এখানে ভর্তি হবার জন্য ভিড় করে। স্কুল আজ দারুণ নাম পেয়েছে। এত করে দেবেনবাবু প্রকাশ্যে এইসব কথা শুনবেন তা ভাবেন নি। নীরব রাগে অপমানে কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ।

তবু বলেন তিনি, এসব কি বলছো পরেশ।

রমেশের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়, পরেশবাবু বলুন?

দেবেনবাবু চাইলেন ওদের দিকে।

ওই রমেশ একদিন অতীতে এখানে এসেছিল জীর্ণ শীর্ণ দেহ, ছেঁড়া ময়লা পোশাক। দেবেনবাবুই সেদিন ওকে ভর্তি করে ছিলেন বিনা মাইনেতে। বইপত্রও দিয়েছিলেন নিজে। আট বছর ছিল এই স্কুলে দীন দরিদ্রের মত।

আজ ওর কঠিন কণ্ঠস্বর দেবেনবাবুর কাছে বিচিত্র ঠেকে, কি যেন অনাগত কালের কঠিন হুঙ্কারের মত শোনায়।

রমেশের কণ্ঠস্বর যদুপতিবাবু চেয়ারম্যান। তিনিও রমেশ আর পরেশের কাছে এসব কথা, মন্তব্য আশা করেননি।

রমেশ দলবেঁধে শলাপরামর্শ করে এসেছে মিটিংয়ে ঝড় তুলতে, ওরা এই কমিটি বাতিল করে নতুন ইলেকশন করে অন্য কমিটি করতে চায়, যারা স্কুল চালাবে।

রমেশ বলে নতুন ইলেকশন করাতে হবে। এই কমিটিরে মিয়াদ শেষ করতে চাই।

ইলেকশন করাবার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে এটাই বুঝেছেন তিনি রমেশ যে এইভাবে নির্মম হয়ে উঠবে, তা ভাবতে পারেননি।

যদুপতিবাবু বলেন।

ছাত্রকে 'তুমি' বলেছেন দেবেনবাবু, ছাত্র যদি গুরুকেও না মানে সেটা শিক্ষাক্ষেত্রের অপবিত্রতা নষ্ট করার সামিল বলে মনে করি। এক্ষেত্রে দেবেনবাবু অন্যায় কিছু করেননি পরেশ বলে।

যতীনও কমিটির মেম্বার। সেও মিটিংয়ে এসে আজ একটু অবাক হয়েছে। রমেশ সরকার তৈরি হয়েই এসেছে এটা বুঝেছে যতীন,

হরিহরবাবু বলে,

সেটা না হয় মেনে নিলাম। ছাত্রকে 'তুমি' বলেছেন ঠিক আছে। কিন্তু ওইসব হিসাবপত্রের গলদকে তো মেনে নিতে পারি না। সব বিল ভাউচারও নেই, ওসব মনগড়া হিসাবে অনেক কারচুপি আছে। তদন্ত করে ওই হিসাব পাশ করতে হবে।

দেবনবাবুর উপর ওরা আজ ঘৃণা সন্দেহ করছে।

দেবেনবাবু বলেন,

আমি বলছি এসব ঠিক আছে। আমি নিজে এতকাল দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়েছি। খোলার চাল থেকে তিন তলা বাড়ি করিয়েছি স্কুলের—

বিলাসবাবু বলে, তারজন্য কত টাকা তছরূপ হয়েছে তার তো হিসাব নেই। এ হিসাব পাশ হবে না।

দেবেনবাবু বলেন,

তদন্তসাপেক্ষে পাশ করা হোক। পাশেই নতুন বাড়ির ছাদ এই মার্চ-এর মধ্যে ঢালাই, অন্য কাজ না করলে টাকাটার গ্রান্ট ল্যাপ্স করে যাবে। টাকা ফেরত চলে যাবে। ওই হলটা শেষ হোক।

রমেশ এবার যেন বাগে পেয়েছে।

সে বলে, না। আর চুরি হতে দিতে পারি না—কাজ হবে না।

দেবেনবাবু আর্তকণ্ঠে বলেন,

রমেশ! হলটার কাজে বাধা দিও না। ওটা শেষ করতে দাও। তারপর দরকার হয় আমিই চলে যাব।

বিলাসবাবু জানে সে ক্ষেত্র তৈরি করে এনেছে। দেবেনবাবুকে সরাতে পারলে সেইই হবে স্কুলের হেডমাস্টার, সর্বেসর্বা। তার ভাইপোকেই বিল্ডিং-এর ঠিকাটা দিতে চেয়েছিল। তাতে তারও কিছু কমিশন থাকতো, কিন্তু দেবেনবাবু আর যদুপতিবাবুরাই সেটা করতে দেননি। এবার বিলাসবাবু সেই প্রত্যাখানের জবাবই দেবেন।

বিলাসবাবু বলেন,

চলে যেতে চান সেটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু পুরো হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে নতুন কমিটির কাছে। এ কমিটি ওই হিসাব পাশ করাতে পারবে না।

যদুপতিবাবু চাইলেন ওদের দিকে।

এতদিন কোন ঝড়ই ছিল না। একভাবে স্কুল চলেছে। উন্নতি করেছে স্কুলে সবকিছু দিয়ে। আজ সেখানে এই ঝড়ের সংকেত দেখেছেন তিনি। আর বুঝেছেন এর মূলে রমেশই। সে চারিদিকে স্বার্থপর, অশুভ শক্তিকে জাগিয়ে তুলে সেইটাকে মূলধন

করে রাজনীতিকে টেনে আনতে চায়!

যদুপতিবাবু বলেন, এ কমিটির আমলে খরচ হয়েছে। এই কমিটি সেটা পাশ করতে পারবে।

রমেশ বলে,

অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে দেব না। সামনের মাসে ইলেকশান করতে হবে নতুন কমিটির। নির্বাচন অনেক আগেই করা উচিত ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে করা হয়নি।

যদুপতিবাবু জানেন সেটা। কিন্তু স্কুল গড়ার কাজে অসাধুতা দেখেননি। কাজটাকেই বড় করে দেখেছিলেন। তাই নির্বাচন করা হয়নি। আজ সেই প্রশ্ন তুলেছে ওরা।

যতীন বলে,

নির্বাচন হতে পারে, কিন্তু অডিটেড অ্যাকাউণ্ট, আপনারা আগের মিটিং-এ ওই অ্যাকাউন্ট অডিটরের কাছে পাঠাবার আগে টো টো পাশ করেছেন, মিনিটস্ বুকে সেই সই আছে, আজ হঠাৎ দলবেঁধে এই বাজে আপত্তি তুলে মিটিং-এর সময় নষ্ট, বাজে কথা বলে শিক্ষায়তনের পরিবেশকে অশুচি করছেন কেন? এ প্রসঙ্গ ওঠেই বা কেন? তাহলে সেদিন পাশ করলেন কিভাবে? এটা নিছক স্বার্থপ্রণোদিত, অভিসন্ধিমূলক। ব্যাপারটা এত গভীরে ভাবেনি বিলাসবাবু, রমেশ সরকার।

আরও দু'চারজন অভিভাবক সায় দেন। তাঁরা দেবেনবাবুকে শ্রদ্ধা করেন, এ ধরনের মন্তব্য আশা করেননি।

তাঁরা বলেন, ঠিক কথা! তাহলে আজ সেই কথা অস্বীকার করছেন আপনারা?

যদুপতিবাবুরও খেয়াল হয়।

সেই খাতাখানা দেখে বলেন, এ প্রসঙ্গ আর উঠতে পারে না। অ্যাকাউন্ট পাশ করতে হবে। আপনারা আগেই সম্মতি দিয়েছেন।

রমেশ সরকার চুপসে গেছে।

যতীন এভাবে আইনের কথা তুলে তাদের থামিয়ে দেবে সেটা ভাবতেও পারেনি। ওরা বাধ্য হয়ে মত দিলেও রমেশবাবু বলে,

নতুন ইলেকশন-এর দিন ঠিক করতে হবে এই মিটিং-এ।

দেবেনবাবুও বুঝেছেন তাঁর এতদিনের পরিশ্রম, নিষ্ঠার আজ এরা কোন দামই দিতে চায় না। নিষ্ঠুর অপমানে তাকে বিদায় করতে চায় এই প্রতিষ্ঠান থেকে। ওদের নির্লজ্জ স্বার্থান্ধ রূপটাকে দেখেছেন তিনি।

যদুপতিবাবু বলেন, তাই হবে। তবে রমেশ, তোমাদের অনুরোধ করব এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হোক এমন কিছু করবে না।

রমেশ বলে, তাই তো নির্বাচন চাইছি। এতকাল ধরে একই কমিটি স্কুল চালাতে গিয়ে অনেক দুর্নীতির প্রশ্রয়।

দিয়েছে সেটা আর বলতে পারবে না। তাছাড়া কমিটি মেম্বার বেশির ভাগ বুড়ো, কাজ করার সাধ্য নাই। তাই তাঁদের বিদায় করে এখানে নতুন মানুষদের আনতে চাই!

আজ ওরাই জয়ী হয়েছে। দিনও স্থির হয়ে যায়। ভোট যে হবে দেবেনবাবু কথাটা ভেবেছেন। বেশ বুঝেছেন এবার রমেশের দল সবকিছুকেই দখল করবে।

রমেশ বুঝেছে তার সামনে পথ পরিষ্কার। প্রতিবাদ করার কেউ নেই। বাজারের দোকানদারদের তার দলবল ঠাণ্ডা করে নিজেদের একটা রোজগারের পথ করেছে। পুলিশের কিছু লোকজনও খুশী।

এবার বুলুর দল কলোনীর কিছু ছেলেদের চাল চালানের কাজে লাগিয়েছে। আর এ কাজে মূলধন যোগাচ্ছে বাজারের নবীন বাবু। নবীন দত্তের আড়তদারি ব্যবসা, ইদানীং গোপন পথে লোহালক্কড়, সরষের তেল, ডালডার পেটিও আসে ওর গুদামে। ওসব আনে বুলুর দল ওয়াগান ভেঙে।

ইদানীং রেললাইনের আশেপাশের কলোনীর বেশকিছু ছেলে-মেয়ে বৌদের চালের কাজে নামিয়েছে। বর্ধমান খানাজংশন এলাকাতে তারা দলবেঁধে গিয়ে ওখান থেকে বস্তাবন্দী চাল আনে, কলকাতায় বাইরের চাল আসা নিষেধ, রেশনিং এলাকা।

পতিত বলে. ইয়ে কইব্যাদি এমন আইনে। বুলুদা চাল এস্মাগলার এর দলকে ধরবে কোন্ ব্যাটা? দিমু না ন্যাপলা চালাই।

পতিত ওদের দলের নেতা সেজে সঙ্গে থাকে।

ওর সঙ্গে থাকে কিছু টাকা, আর ওই ধারালো ন্যাপলা না হয় চেম্বারও। ভালো কথায় কাজ না হলে ওই পথ নেয়।

স্টেশনের পুলিশ. হোমগার্ডদেরও কিছু প্রণামী দিয়ে ঠিক ঠিক মাল আনে ওরা এখানে নিয়মিত।

পতিত এর মধ্যে মেল ট্রেনের গার্ড ড্রাইভারদের হাত করে ফেলেছে যাদুমন্ত্র বলে।

ঠিক কলোনীর কাছাকাছি এসে দার্জিলিং মেল, আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস সব ট্রেনই গতি কমিয়ে আনে, কলোনী থেকে লোকজন মেয়েরাও বের হয়ে আসে।

ধুপ ধাপ করে চালের বস্তা পড়ছে রেললাইনের দুদিকে। হাঁক ডাক করে কার মাল সেটা জানানো হয়। মালপত্র দেখতে দেখতে উধাও হয়ে যায় কলোণীর ভিতরে।

ট্রেম আবার গতিবেগ বাড়ায়।

স্টেশনে অবশ্য পুলিশ-হোমগার্ড সকলেই তৈরি হয়ে আছে। মাল সব আগেই পাচার হয়ে গেছে। রোজই এই কাণ্ড ঘটে।

বুলু-পিনুর দল এই করে কলোনী মহলে দলের জনপ্রিয়তার সৃষ্টি করেছে। কিছু নগদ বখরাও মেলে। আর রূপলাল এখানের এখানের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করেছে বুলু, পিনুদের সাহায্যে

রাতের অন্ধকারে ভাটি জ্বেলে মদ তৈরী হয়। রাতারাতিই পাচার হয়ে যায়।

আর দিনের বেলায় এই জায়গার অন্যরূপ তখন রূপলাল এর দুধের ব্যবসা। বেশ কিছু গরু মোষ এনে খাটাল বানিয়েছে। সকাল সন্ধ্যা দুধের কারবার চলে। তারই লম্বা চালার একপ্রান্তে তৈরি হয় দেশী মদ। রাতে দিনেও চারিদিকের এলাকা থেকে মেয়েছেলেরা আসে ব্লাডার, টিউবে মদ পুরে তারা পাচার করে। আর কিছু মাল দুধের ক্যানের পাশাপাশি বসিয়ে দিব্যি চলে যায় বিভিন্ন এলাকার মহাজনদের কাছে।

এসব কাজে ওদের সহযোগিতা থাকে।

বুলু-পিনু দুজনের ইদানীং মোটর সাইকেল হাঁকিরে চলে। পরনে টেরিলিনের প্যান্ট-সার্ট, হাতে বালা। গলায় সোনার চেন। সব মিলিয়ে ওরা এই এলাকার সুপরিচিত ব্যক্তি হয়ে উঠেছে রমেশদার দৌলতে।

রমেশদারও ওদের দরকার।

সমাজের একদিকে চলে মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাবাদী লোকের শোষণ, শাসন গড়ে ওঠে অন্ধকারের রাজ্য। কিছু অন্ধকারের জীবরা সেখানে তাদের স্বত্ব কায়েম করে রাখে নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত।

তবু এই অন্ধকারের পাশে কিছু আলোর সন্ধানও থাকে।

যতীন আর ওই লালু, পটল, গোবিন্দের দলও বসে নেই। যতীন বেশ বুঝেছে রামেশের মতিগতি সুবিধার নয়। তাই যতীনই নিজে ওই ছেলেদের নিয়ে এগিয়ে আসে।

স্কুলের ইলেকশন এর প্রস্তুতির পাশে, যতীন নিজে কলকাতায় কোন মন্ত্রীকে ধরে এই হাসপাতালের ব্যাপারে কথা বলে।

ওরা এর মধ্যে যদুপতিবাবু আরও কিছু লোককে নিয়ে

কমিটি করে জমিটা কিনেছে যতীন, তাই নিয়েই দরবার সিংও চটে আছে।

রমেশ ও খুশি নয়।

কারণ জায়গাটায়, দরবারা সিং এর গ্যারেজ করে দিতে পারলে রমেশের মাসকাবারির রোজগার কিছু থাকতো। তা হয় নি, তাই রমেশ খুশি হয়নি।

কিন্তু হাসপাতালের ব্যাপার প্রকাশ্যে প্রতিবাদও করতে পারেনি। যতীন তবু এসেছিল রমেশের কাছে।

রমেশ বলে আমার দ্বারা যা হবে নিশ্চয়ই করবো।

কিন্তু কিছুই করেনি রমেশ।

যতীন একাই যেন বিপদে পড়ে। এতবড় কাজ সাবিত্রী আসে যতীনের এখানে।

এখন সেও মেয়ে মহলে কিছু চাঁদা তুলছে হাসপাতালের জন্য।

স্কুলের মেয়েরা একটা অনুষ্ঠানও করে হাসপাতালের জন্য। কিছু টাকাও ওঠে।

সাবিত্রী বলে যতীনকে একা নেমে পড়লে, এখন কি হবে? যতীন বলে কাজ ঠিকই হবে। জমি পেয়েছি বাড়িও হচ্ছে, বাকী কাজ হয়ে যাবে সাবিত্রী।

সাবিত্রী শুধোয়, রমেশবাবু কিছু সাহায্য করবে? হাসে যতীন, বলে।

—আমি নিজে গেছলাম, কথা দিল মাত্র।

সাবিত্রী বলে তাদের কথার দাম কি? দেখবে সাহায্য করবে না, উল্টে কলকাঠি না নাড়ে। এরাই এখন জনদরদী নেতা।

যতীনও চেনে তাদের।

তাই বলে ওসব ভেবে লাভ নেই সাবিত্রী।

সাবিত্রী শোনায় এখন দ্যাখো কাজটা যদি হয়।

যতীন দেখছে এখনও সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা স্বতঃ-

প্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করতে চায় মহৎ কাজে। তারা আসে নিজে থেকে মুছে যায় নি।

তাই এই হাসপাতাল গড়ে উঠেছে।

ছোট থেকেই এর যাত্রা শুরু হয়। যতীনের অক্লান্ত পরিশ্রম আজ সার্থক হয়েছে।

সাবিত্রী ও খুশি হয়েছে যতীনের এই সাফল্যে।

সারা এলাকাতে এই প্রথম হাসপাতাল শুরু হ'ল।

আজ এই এলাকার মানুষের কাছে এ যেন এক শুভ দিন।

নতুন হাসপাতাল বাড়িটাকে সাজানো হয়েছে ফুল, মালা, আলোর রোশনী দিয়ে। যতীন ঘটা করে উদ্বোধন অনুষ্ঠান করছে। লালু গোবিন্দ, পটলের দলও ব্যস্ত।

তারাও ক'মাস যতীনদার সঙ্গে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছে। এসেছে এলাকার বহু মানুষ।

যদুপতিবাবু গেছেন। সারা এলাকার লোকজন মহিলারাও এসেছে ভিড় করে। আজ রমেশও এসেছে। কিন্তু দেখেছে রমেশ এবং অনেকেই তাকে যেন এড়িয়ে চলছে।

সাজানো মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। লালুর দল, অন্যান্য ছেলে মেয়েরা সকলে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে, নানা কাজে ব্যস্ত। উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইছে সাবিত্রী।

রমেশও চেনে সাবিত্রীকে। এর আগে রমেশ সেই দরিদ্র অবস্থায় পড়ে থাকায় সময় বহুবার এসেছিল দেবেনবাবুর বাড়িতে। তাকে বিনা অর্থেই স্পেশাল কোচ্ করতেন দেবেনবাবু।

তখন সাবিত্রী ছিল ছোট। দুজনে দুজনকে চেনে।

আজ সেই সাবিত্রী সাদা খোলের লাল-পাড় শাড়ি, চুলগুলো খোলা। যেন শুচিস্নাত একটি নারীমূর্তি তন্ময় হয়ে গাইছে।

সবারে করি হাহ্বান—

রমেশ দেখছে নোতুন একটি মেয়েকে।

হঠাৎ মনে হয় রমেশের অনেক কিছুই তাকে পেতে হবে। নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা-অর্থ! সবকিছু আর সাবিত্রীকেও।

বুলু পাশেই ছিল, সেও দেখছে রমেশকে। বলে ওঠে সে চাপা স্বরে, লাটখানা কিন্তু খাসা গুরু! তোমার নজর আছে।

রমেশ এর আগে সাবিত্রীর সঙ্গে মিশেছে কিন্তু সাবিত্রীই পাত্তা দেয় নি তাকে আজ রমেশের যেন জেদ। কিন্তু রমেশ এসব কথা প্রকাশ করতে চায় না। তাই বুলুদের রমেশ ইশারায় চুপ করতে বলে এগিয়ে গেল।

ইরা সেন সর্বঘটে কাঁঠালী কলার মত সর্বত্রই বিরাজ করে। সেও হাসপাতালের উদ্বোধনে এসেছে। নিজে একশো একটাকা চাঁদাও দিয়েছে। আগরওয়াল, দরবারা সিংরা কারবারী লোক। তাঁরাও চাঁদা দিয়েছে। এসেছে আজ তারাও এই অনুষ্ঠানে।

ইরা দেখছে রমেশকে।

রমেশের চোখে ওই সাবিত্রীকে দেখে তার ভাবান্তরটা চতুর মেয়েটির দৃষ্টি এড়ায়নি। রমেশ এসে এদের কাছেই বসেছে।

ইরা সেন বলে, বিরাট ব্যাপার করেছে যতীন।

রমেশ বলে, তাই দেখছি।

ভানু আগরওয়ালা বলে,

এবার যতীনও বেশ পপুলার হয়ে উঠছে। কাজের ছেলে। স্কুল কমিটির ইলেকশনেও দাঁড়াচ্ছে শুনলাম।

রমেশ একটু অবাক হয়। মনে মনে সে ভয়ও পায়। কারণ যতীন এখানেরই বাসিন্দা। ওদের বনেদী আমলের বিরাট বাড়ি বাগান পুকুর সবই আছে। ভাই দাদারাও বেশ কৃতি। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, এক ভাইয়ের ব্যবসা আছে কলকাতায়। আর যতীন নিজেও এখানে পরিচিত আর জনপ্রিয়।

ও এগিয়ে এলে রমেশের একটু অসুবিধাই হবে তবু রমেশ সেটা প্রকাশ না করে বলে,

আমি দাঁড়িয়েছি আপনাদের ভরসায় আর কিছু গরীব সর্বহারাদের জন্য। আপনারা যদি চান জিতবো, কিছু কাজ করার সুযোগ পাবো। না চান, আসব না। তবে বেশ কিছু দুর্নীতি আর ঘুঘুর বাসাই ভাঙতে চাই।

ইরা সেন বলে, যতীনবাবুও সেই কথা বলে।

হাসে রমেশ, তুমি কি বল ?

ইরা সেন হাসল। ওর হাসিটা এতদিন ভালই লেগেছে রমেশের, কিন্তু আজ সাবিত্রীর ওই লাবণ্যভরা দেহ, তার রূপ রমেশের মনে একটা নতুন সাড়া এনেছে।

সামনে তার একটা চ্যালেঞ্জ।

রমেশ ফিরছে। এবার তাকে তৈরি হতে হবে যতীনের বিরুদ্ধেই।

পিনু সব খবরই রাখে। সে বলে।

যতীন ওই দেবু মাস্টারের ওখানে যায়, খুব মানে গণে দেহি। তয় আসল মতলব কি জানো ওর ? ওই মাস্টারের মাইয়ার লগে জমেছে। মাস্টারের পোলা লালুও তাই মদত দেয়। সাবিত্রী ফিরছিল এই পথে।

হঠাৎ সাবিত্রীকে আসতে দেখে চাইল রমেশ। এখনও এদিকটা একটু নিরিবিলি। পুরনো আমলের একটা মজা পুকুরের জল ঢেকে আছে ঘন কলমী দাম শেওলায়। পুকুরের ধারে দু'একটা আম নারকেল গাছ জায়গাটিকে ছায়াঘন করে রেখেছে।

সাবিত্রী ভাবে নি রমেশকে এখানে দেখবে সে।

রমেশকে নিয়ে শহরের অনেক কথাই শুনেছে সে। বাড়িতেও দেখছে বাবাকে কেমন ভেঙে পড়তে। রমেশ এগিয়ে আসছে।

সাবিত্রীও রমেশকে দেখে দাঁড়াল। সাবিত্রীও সব কথাই শুনেছে।

বাড়িতে দেখেছে বাবাকে মলিন বিষণ্ণ মুখে ঘুরতে। জীবনে এতবড় অপমানিত তিনি হননি। দেবেনবাবু বলেছেনও এ চাকরি আর করা যাবে না। রমেশকে নিজে মানুষ করেছি, আজ সেই রমেশ প্রকাশ্য সভায় এমনি অপবাদ দেবে ভাবিনি।

সাবিত্রীও শুনেছে কথাটা।

আজ সাবিত্রীও জানে রমেশের স্বভাবএর পরিচয়। যদুপতি-বাবুর মত শ্রদ্ধেয় লোক যে তাকে ঠাঁই দিয়েছিল তাকেই ছেড়ে এসেছে নিজের স্বার্থে। আজ তাঁর বিরুদ্ধেই কথা বলে।

রমেশ এগিয়ে এসে শুধোয়—ভাল আছ তো সাবিত্রী? সাবিত্রী দেখছে লোকটাকে।

বলে সে, ভালই আছি। রমেশ বলে, কতদিন দেখা হয়নি। পড়াশোনা কেমন চলছে?

সাবিত্রী বলে, বি-এ দিয়েছি অনার্সও ছিল!

রমেশ বলে, ভাল ভাবেই পাশ করবে। তারপর চাকরি করতে চাও, দেখা কর আমার সঙ্গে।

সাবত্রী হেসে ফেলে।

বলে সে, আজকাল তুমি কেউকেটা। সবাইকে ডেকে ডেকে চাকরি দিচ্ছ নাকি?

রমেশ বলে না না, তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হব।

সাবিত্রী এগিয়ে যেতে যেতে একটু থেমে বলে ঃ

ধন্যবাদ। কথাটা জানা রইল। একদিন তুমিই লোকের দয়া কুড়িয়ে কুড়িয়ে মানুষ হয়েছ, এই যদুপতিবাবু আমার বাবা আরও অনেকের, কিন্তু সেই লোকদেরই তুমি অপমান করতে চাও নিজের তুচ্ছ স্বার্থে। তুমি চাকরি দেবে সেটাও কি বিনা স্বার্থে?

রমেশের মুখটা তামাটে হয়ে ওঠে রাগে অপমানে।

তাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই সাবিত্রী চলে গেল। রমেশ দেখছে ওকে। আজ তাকেও চরম অপমান করে গেছে সাবিত্রী।

রমেশ নিজের সেই বেদনাময় অতীতের কথা ভুলতে পারে না। সেই অসহায় জীবন পর্বটাকে সে মুছে ফেলতে চায়, তাই ওই নিয়ে কেউ ইঙ্গিত করলে রমেশ সহ্য করতে পারে না।

পিনু রমেশকে গম্ভীর ভাবে ফিরে আসতে দেখে ব্যাপারটা অনুমান করে বলে,

ছুঁড়িটার খুব ডাঁট। যতীনদার জন্যেই এসব। বল তো দিই সিধে করে ওটাকে। লালুটাও খুব বেড়েছে।

রমেশ বলে, ওসব কথা ছাড় তো। চল আজ মিটিং আছে তিন নম্বর বস্তিতে।

রমেশ এই সব কথা যেন অগ্রাহ্য করতে চায়। কিন্তু রমেশ ওটা বলে মাত্র।

মনে মনে সে রাগটাকে পুষেই রাখে, সময় মত জবাবই দেবে সে ওদের।

দেবেনবাবু ছোট ছেলে লালু ক্রমশ পল্লীর নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছে।

লালু এবার স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে মোটামুটি ভাবে। এখন সে তার ক্লাব নিয়েই ব্যস্ত। সারা এলাকার আশেপাশের অঞ্চলের ক্লাবদের নিয়ে এই মাঠে বিরাট অনুষ্ঠান করছে লালুর দল।

বাড়ির কথা ভাবার সময় তার নেই।

তবু বাড়ির থমথমে পরিবেশ, বাবাকে চুপচাপ থাকতে দেখে একটু অবাক হয়। বাবা সকাল থেকে রাত্রি অবধি স্কুল নিয়েই

থাকেন। মাঝে দুপুরে খেতে আসেন কিছুক্ষণমাত্র। এহেন দেবেনবাবুকে কদিন বাড়িতে চুপচাপ থাকতে দেখে লালু শুধায় সাবিত্রীকে :

—কি রে– হেডস্যার ক'দিন চুপচাপ ! ব্যাপার কি !

সাবিত্রী এর মধ্যে দুএকটা টুইশানি ধরেছে, তবু সে তার হাত খরচটা নিজে তুলে নেয়। বাবার কাছে হাত পাততে তার বাধে। লালুর অবশ্য সে সব বালাই-ই নেই। সে মা দিদির কাছেই হাত পাতে সহজেই।

সাবিত্রী বলে,

বাবা বোধহয় স্কুলে চাকরি আর করবেন না, এখন ছুটি নিয়েছেন ক'দিন। নতুন কমিটিতে যদি রমেশবাবুরা আসতে পারে, তাহলে বাবাকে ওরা অপমান করে তাড়াবে। বাবার নামে ওরা অনেক আজেবাজে কথাই বলছে। তাই বাবা চাকরী ছেড়ে দেবেন।

লালুর তরুণ তাজা রক্তে মাতন জাগে। ওই লোকটাকে সে গভীর শ্রদ্ধা করে, দেখেছে সে তার বাবাকে। সর্বকিছু ত্যাগ করে তিনি স্কুল গড়েছেন আর বেশ কিছু লোক সেই ফাঁকে সুবিধা লুটেছে।

রমেশ সরকারের সম্বন্ধে শুনেছে অনেক কিছু। ওর সহচর পিনু আর বুলুদেরও চেনে লালু। সারা এলাকার অনেক অকাজ কুকাজ তারা করে, আজ সেই বেইমান রমেশকে ওই সব কথা বলতে শুনে গর্জে ওঠে লালু।

—কে কি বলে বাবার নামে, বল। শালাদের জিব টেনে ছিঁড়ে দেব ! ওই রমেশটাকেও চিনি। বেইমান, যে পাতে খায় সেই পাতেই হাগে ! আর ওর মস্তানি ওই বুলু পিনুদের জন্যই। ওদেরও সিধে করে দেব।

সাবিত্রী চমকে ওঠে। তার ভাইয়ের এই মূর্তি সে দেখেনি।

বলে সাবিত্রী, এসব কি বলছিস!

হঠাৎ যতীনকে ঢুকতে দেখে চাইল। যতীনও শুনেছে লালুর কথাটা। চটে উড়েছে লালু। চটে ওঠাই স্বাভাবিক।

যতীন বলে, এভাবে ওদের জবাব দেওয়া যাবে না লালু! এর জবাব দিতে হবে ওদের কথা মিথ্যা, ওরা অপদার্থ স্বার্থপরের দল এইটাই প্রমাণ করে। তাই আমিও যদুপতিবাবুদের সঙ্গে নিয়ে ভোটে দাঁড়াচ্ছি। আমরা ওদের রুখবোই। যদি পারো তবে আমাদের সাহায্য করো যাতে এই অন্যায়কে হটাতে পারি।

লালু কি ভাবছে। সাবিত্রী বলে, যা করবি মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে করবি, না হলে বিপদই হবে।

যতীন বলে গোলামাল করলে রমেশদেরই লাভ হবে। তাই চুপবরার থাকে এখন ভোট হয়ে যাক।

গোবিন্দ বলে, ওই রমেশদা এখন দল পাকিয়ে সব কিছুকেই দখল করতে চায়! যদুদাকেও অপমান করে? পটলা বলে, বলনা, দিই একদিন টাইট করে!

পটলা ব্যায়াম সমিতির পাণ্ডা। সারা এলাকার ছেলেদের কাছে পটলা সুপরিচিত। বিশাল দেহ, তেমনি বলশালী সে। তার দলবলও কম নয়।

লালু বলে, পিনু, বুলুর দলও আজকাল বেড়েছে। বাজারে প্রায়ই হামলা করে, জোর করে চাঁদা তোলে, মদের ব্যবসাও চলছে জোর।

পটলা বলে, একদিন ওদেরও দেখে নেব।

লালু বলে, এখন থাক। স্কুলের ব্যাপারটা চুকে যাক তারপর যা হয় করা যাবে। যতীনদা বলেন, এখন ওসব করিস না।

সারা এলাকায় সাড়া পড়ে গেছে। বৃদ্ধ যদুবাবুও বের

হয়েছেন আবার, তার পাশে এসেছে যতীন, সঙ্গে আছে সারা এলাকার অনেক মানুষ। লেবু বাগান মাঠে মিটিং হচ্ছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। স্টেশন থেকে বের হয়ে আসছে অফিস ফেরৎ জনতা। পাড়ার লোকজন মেয়েরাও এসেছে।

হঠাৎ আলোগুলো নিভে যায়। লোডশেডিং প্রায়ই হয়, এ নিত্যকার ঘটনা।

তাই যদুপতিবাবু বলেন, আপনারা স্থির হয়ে বসুন! ব্যাটারি মাইকে ওদের বক্তব্য শোনা যাক।

হঠাৎ গোলমালটা বাধে পিছনের দিকে।

দু তিনটে বোমাও ফেটেছে ধোঁয়া বিস্ফোরণের শব্দে চীৎকার ওঠে ভীত ত্রস্ত জনতার মাঝে।

লালুও নজর রেখেছিল। আশপাশে ছিল ওর দলবল। তারাও ভাবতে পারেনি যে এই শান্তিপূর্ণ অভিভাবক, স্থানীয় লোকজন মেয়েদের মধ্যে কেউ এমনিভাবে বোমা ফাটাবে, মিটিং পণ্ড করতে চাইবে।

এর আগে রমেশ সরকারও মিটিং করেছে, কোন গোলমাল হয়নি। আজ এইসব ঘটনা ঘটতে তারাও অবাক হয়েছে। পটলা ওদিকেই ছিল।

অন্ধকারে সে পলায়মান কয়েকজনকে দেখে তাড়া করেছে, তারা ছুটে পালাবার মুখে আরো দু'একটা বোমা ফাটায়।

তবু এরা তাড়া করেছে, জনতা বুঝেছে ব্যাপারটা। গোলমাল কলরব ওঠে।

পটলা বলে, এক শালা পালাতে পারেনি ঠিক পুকুরের পানার মধ্যে আছে।

ওরা খুঁজছে, চারিদিকে ছেলেরা জুটে গেছে।

যতীন, যদুবাবুরা ও অবাক' একানে মিটিং এ এই প্রথম গোল-মাল হলো;

আর কারা করেছে সেটা অনুমান করতে পারে।

লালু যতীনের কথাগুলো ভাবছে।

এখন ক্লাবের জরুরী মিটিং আছে, লালু চলে গেল, বলে যতীনকে,

—পরে দেখা হবে যতীনদা, এগিয়ে কথা হবে।

রাত নেমেছে, পথও নির্জন হয়ে আসে। ওদিকের ঘরে দেবেনবাবু যতীনের কথাগুলো শুনছেন,। যতীন বলে,

রমেশদের এই অন্যায় সইব না স্যার। তাই আমিই দাঁড়িয়েছি ভোটে, আর ক'জন ও দাঁড়িয়েছে আমার কথামত।

রমেশদের বাধা দেবই। আপনি এখনই রেজিগনেশন দেবেন না। দেবেনবাবু বলেন,

—আর কাজ করতে ভালো লাগে না যতীন। কাজের পরিবেশ, ওয়ার্ক কালচারই এই স্বার্থপরের দল নষ্ট করে দিয়েছে।

যতীন বলে—না স্যার। এ হতে দেব না, আজ চলি পরে কথা হবে।

যতীন বের হয়ে আসে দেবেনবাবুর ঘর থেকে।

বাইরে সাবিত্রী অপেক্ষা করছিল। যতীনকে বের হয়ে আসতে দেখে সে ওর সঙ্গে বাইরে এল।

গাছগাছালির বুকে আঁধার জমেছে। জোনাকির দল হাওয়ায় ওড়ে অগ্নিকণার দ্যুতি নিয়ে।

সাবিত্রী বলে—বাবা খুব ভেঙ্গে পড়েছেন।

যতীন শোনায়—এ সময় ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। শক্ত হতে হবে।

সাবিত্রী দেখছে যতীনকে, যতীন বলে,

—আমরা তো আছি। যদুবাবুও লড়ছেন এখনও।

সাবিত্রী বলে—তোমরাই বাবার ভরসা যতীনদা। ওই রমেশের দলও সাংঘাতিক। কি করবে কে জানে?

একা এত রাতে ঘোরা-ফেরা করো—ভয় হয়!

যতীন দেখছে সাবিত্রীকে।

—ভয়;

যতীনের কথায় সাবিত্রী বলে

—তোমার উপরই ওদের বেশী রাগ। যদি কিছু করে—হাসছে যতীন। বলে সে

—এ তোমার বাজে ভাবনা সাবিত্রী। ওদের এত সাহস হবে না। চলি।

সাবিত্রী বলে—সাবধানে যেও।

যতীন স্কুটার নিয়ে চলে গেল।

লালুর দলও বসে নেই। তাদের ক্লাবের অনুষ্ঠান এর মাথা লালু আজ গোবিন্দদের ওই যতীনদার কথাটাও শোনায়।

বলে গোবিন্দ

—ব্যাটা রমেশ দেখি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ওই বাঁদর-গুলোর সঙ্গে মিশে এখানে শিকড় গাড়তে চায়।

লালু বলে

—তাই সবকিছুই দখল করতে চায়। ওই স্কুলও। ওদের হাতে পড়ে গেলে সব তছনছ হয়ে যাবে।

গোবিন্দ বলে, নতুন কারখানায় ছেলেদের চাকরী হবে বললো, কিন্তু হলো ওই রমেশের দলের ক'জনের।

আমাদের কি করলো ওই রমেশ বাবু?

পটলা বলে আমাদের জন্য ওরা কিছুই করবেনা। উল্টে বাঁশ দেবার চেষ্টাই করবে। রমেশের যাতায়াত বেড়েছে থানায়। নতুন ওসির সঙ্গে দেখি জিপ নিয়ে ঘোরে।

গোবিন্দ বলে, আমাদের পিছনেই না পুলিশ লেলিয়ে দেয়।

লালুও ভেবেছে কথাটা।

পুলিশ কই শিবু, বুলুর দলকে কিছুই বলেনা। ওদের

বাজারের তোলা আদায়, রাতে চুল্লুর ব্যবসা, রাতের অন্ধকারে টেম্পো বোঝাই করে টানা মাল পাচার করা এসব যেন দেখেও দেখে না কোন বিচিত্র কারণে।

বরং লালুদের খেলার মাঠ নিয়ে সেদিন গোলমাল হ'ল জায়গার কোন এক শরিকের সঙ্গে। কিছুক্ষণ মধ্যে পুলিশ এসে গেল। এদের শাসাতে থাকে। তারপরই এল রমেশ বাবু আর ফণীবাবু।

ওরা এসে উল্টে লালুদেরই বলে, নন্দবাবুর এই জায়গা জবর-দখল করছো কেন ?

লালু বলে—নন্দবাবুই আমাদের খেলার মাঠ জবর-দখল করতে চান। তাই বাধা দিয়েছি। ওর কোন কাগজপত্র। দেখান ছেড়ে দবো। না হলে ওকে কেন ছাড়বো জায়গা।

নন্দবাবুর কাগজপত্রও নেই। তাই সরে যেতে হলো। রমেশ লালুদের উপর খুশি হয় নি সেদিনও।

লালুরা রমেশকে যেন মানতে চায়না, এইটাই বুঝেছে রমেশ।

তাদেরই একজন পুকুরে পড়েছে পালাতে গিয়ে। লালুর দল ঘিরে ফেলেছে তাকে। লালু টেনে তুলেছে তাকে।

বাজারের ওদিকে ঘোরে ছেলেটা, ইদানীং পিনুদের সঙ্গেও দেখা যায়।

পটলার এক ঘুঁষিতে ছিটকে পড়ে সে। গর্জাচ্ছে লালু, বল আর কে কে ছিল ? এ্যাই পীতে—

পটলা ওকে টুঁটিতে ধরে মাটি ছাড়া করে তুলেছে, ছেলেটার নাম পীতাম্বর, মুখচেনা এদের। পীতুর শীর্ণ ঠ্যাং দুটো নড়বড় করছে, চিঁ চিঁ করে সে। চোখ দুটো ঠেলে বের হয়েছে।

যতীনই এগিয়ে এসে বাধা দেয়।

ছেড়ে দে ওকে পটল ! মরে যাবে।

পটল ওকে নামিয়ে দিতে ছেলেটা ধপ করে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছে।

সারা অঞ্চলের লোকও জেনে যায় অভিভাবক, স্থানীয় লোকদের শান্তিপূর্ণ মিটিংয়ে বোম ফেলেছে ওই পিন্টু-বুলুর দলই।

এই ঘটনা এখানে নতুন।

এতদিন এই এলাকা শান্তিপূর্ণই ছিল।

যদুপতিবাবু দেবেনবাবুরাও এসে পড়েছেন। যদুপতিবাবু বলেন

এসব ব্যাপার ঘটবে তা ভাবিনি যতীন। দিনকাল এভাবে বদলে গেল? বোমা মারতে এলো এখানে?

এই প্রশ্নটা তাদের মনে জেগেছে।

দেবেনবাবু বলেন, যা নোংরামি বাড়ছে, যে দিন আসছে তাতে আর স্কুলের কাজেও মন চায়না যতীন।

যতীন ভেবেছিল এবার এমন কিছু কাজ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে, কারণ নিছক সেবার ব্রতে কেউ আসছে না। চায় তাদের প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি আর অর্থ।

সেটুকু পাবার জন্য দরকার হলে এবার সমাজের বুকে রক্তাক্ত লড়াই শুরু হবে।

এ তার সূচনা মাত্র। পাবার জন্য লড়াই করবে অশুভ শক্তি, লোভী মানুষ। শুভ শক্তি একে বাধা দিতে যাবে, সেই লড়াইও হবে রক্তক্ষয়ী। লাভ কি হবে জানে না। সমাজে বিপর্যয়ই আসবে কিন্তু এই লড়াইকে থামানো যাবে না। বাড়বেই। একে মেনে নিয়েই চলতে হবে।

যতীন বলে, একে এড়িয়ে চলা যাবে না মাস্টারমশাই। দিন বদলাচ্ছে, মানুষও। আজ তবু এর মধ্যেই টিঁকে থেকে বাঁচার কথা ভাবতে হবে। লড়াই সবে শুরু, ভাল মন্দ, আশা-নিরাশার লড়াই এর থেকে বের হবার পথ নেই।

যদুপতি বলেন

দিন এভাবে বদলে যাবে তা ভাবিনি যতীন। মানুষের সব মূল্যবোধও যেন হারিয়ে যাচ্ছে। জীবনের শেষ পর্বে এসে আর কি দেখব জানি না। তবে যতদিন বাঁচব লড়াই করেই যেতে চাই। তুমি থামবে না দেবেন। স্কুল—ওই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতেই হবে। তাই আজ এই সংঘাতকে এড়িয়ে গেলে চলবেনা। বাধা দিতেই হবে। দেবেনবাবু দেখছেন এই তেজস্বী বৃদ্ধটিকে। আজও তিনি তরুণ এক সংগ্রামী পুরুষ। নতুন করে চেনেন দেবেনবাবু ওই যদুবাবুকে।

খবরটা রমেশের ক্যাম্পে পেঁাছে গেছে।

ইরা সেন-এর ওখানে রমেশ তখন আগরওয়াল, বসন্তবাবুদের নিয়ে ব্যস্ত। ইরা সেনও ইলেকশনের ক্যাম্পেন চালাচ্ছে। তার স্কুলের অবশ্য কমিটি একটা আছে নাম কা ওয়াস্তে এই স্তাবকদের নিয়েই। তারা এসব কিছু দেখে না, ইরা সেন নিজস্ব জমিদারী চালাচ্ছে।

রমেশ বলে, দেবেন মাস্টারকে হাতে আনলে কিছুটা কাজ হয়। ও নাকি এসব গোলমাল চায় না। সরে যেতে চায়!

ইরা চাইল ওর দিকে। বলে ইরা, ওকে আমার স্কুলে কাজ দিতে পারি!

রমেশ বলে ওঠে, ও তো যদুবাবু, যতীনের দলের লোক। তার চেয়ে ওর মেয়ে সাবিত্রীকে যদি কাজ দাও, বুড়ো কিছুটা নিশ্চিন্ত হবে। প্যাসিভ হয়ে যেতে পারে।

ইরা সেন হাসছে।

ওর মনে পড়ে হাসপাতালের মিটিং-এর সেই দৃশ্যটা। রমেশের বুভুক্ষ দৃষ্টিটা সে ভোলেনি। আজ আবার ওই কথা শুনে ইরা ওর মনোভাবটা চেপে রেখে বলে,

দেখি কি করা যায়।

রমেশ শোনায়, স্কুল কমিটিতে তুমিও আসবে ইরা, আগরওয়ালও আসবেন. তারপর দখল করতে হবে ওই হাসপাতাল কমিটি। নার্স ট্রেনিং কোর্স খুলব ওখানে। তোমাকেও ওখানে থাকতে হবে ইরা।

ইরা সেন ক্রমশঃ ধাপে ধাপে উপরে ওঠার স্বপ্ন দেখে। ইরা তাহলে এখানে তার রাজ্যপাট বেশ বিনা বাধাতে চালাতে পারবে।

আগরওয়াল স্কুল কমিটিতে আসতে চায়, কারণ দেবেনবাবু স্কুলের নামে তার কারখানার. ওখানে আগে থেকে সস্তার দিনে বিঘে পাঁচেক জলাজমি কিনে রেখেছিল।

এখন সেই জায়গার দাম বহুগুণ বেড়েছে, আর তার কারখানাকে বাড়াতে হলে সেই জমিটার খুবই দরকার। তাই স্কুল কমিটিতে এসে কোন্ কৌশলে জায়গার জন্য কিছু দাম দিয়ে কিনে নিতে চায়।

আগরওয়াল তাই এত আগ্রহী।

বলে সে, জিতে যাব তো রমেশদা ?

রমেশ বলে, নিশ্চয়ই।

তার লোকবল অনেক। আর বুলু, পিনুর দল, অন্য দু' চারটে দল, স্মাগলারদের লীডার পতিতও রয়েছে।

অন্যদিকে ওই বৃদ্ধ যদুপতি, অসহায় দেবেনবাবু আর ভদ্রলোক যতীনদা, তারা আজকের দিনের বোমা, পাইপগানের যুগকে ভয় করে। তাই রমেশ জিতবেই।

রমেশ বলে, জরুর জিতব। যা ওষুধ দিয়েছি আজ ওরা বুঝবে। একডোজ আজই দিতে বলেছি মিটিং-এ।

হঠাৎ পিনুকে ঝড়ো কাকের মত ঢুকতে চাইল।

পিনুর এসময় সেই মিটিং-এ থেকে গোলমাল করার কথা ছিল। কিন্তু পিনু এসেছে এখানে। রমেশ চাইল পিনুর দিকে। দুটোয় তুই এখানে, ওদিকে মিটিং-এ থাকার কথা। কাজ হল

ওখানে, মিটিং বানচাল করেছিস ?

পিনু বলে, মিটিং-এর বারোটা বাজিয়েছি, তবে পীতু ধরা পড়ে গেছে। শালা ঠিক লড়তে শেখেনি, বোম টপকে সরে যাবি। তা না তাড়া খেয়ে দৌড়ল পুকুরের দিকে। বাস তাদের হাতে পড়ে গেল।

রমেশ চমকে ওঠে, সে কি! ধরা পড়ে গেছে ?

পিনু বলে, লালু, পটলার দল বোধ হয় ধরে ধোলাই দেবে এবার পীতেকে! মর শালা!

রমেশ গর্জে ওঠে, যদি ফাঁস করে দেয় ? আমাদের কাজকর্ম ?

পিনু বলে, শালার লাশ গিরিয়ে দেব।

ইরা বলে ওঠে, তাতে কিছু সুরাহা হবে ? কাজটা ঠিক করোনি রমেশ! এখন কি করবে,

রমেশ কি ভাবছে। বলে সে,

পথ একটা নিতেই হবে ইরা। দেখা যাক কি হয়।

যতীন পীতুকে লালুদের হাত থেকে ছাড়িয়েছে। কাঁদছে ছেলেটা।

বলে, প্ল্যাটফর্মে থাকি। পিনু এসে বল্লে দশ টাকা দেব, চল! নাহলে ওরা মারতো বাবু! কোথাও যাবার জায়গা নেই। খেতে পাই না—

কাঁদছে ছেলেটা।

যদুপতিবাবু দেখছেন ছেলেটাকে। অতীতে একদিন রমেশকে এইভাবেই তুলে এনেছিলেন। মানুষ করেছিলেন, আজ ওই অসহায় ছেলেটাকে বাঁচার তাগিদেই জোর করে খুনে হিসাবে গড়ে তুলতে চায় সেই রমেশ।

পীতু বলে,

বাবা-মা কেউ নাই, দক্ষিণের আবাদে মইরে গেছে রোগের

জবালায়। এলাম শহরে, বাবুরা এই করাচ্ছে আমাকে? আমি ইসব নই গো, বাবা দখিন রায়ের দিব্যি করে বলছি!

এর মধ্যে পটলার ঘাকয়েক প্রহারে পীতুর নাক-মুখ কেটে রক্ত ঝরছে।

লালু বলে, ওটাকে থানায় দিই যতীনদা! পীতু ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরে।

না বাবু, দেবেন না। একবার পুলিশ ধরে নে গে যা মারলো।

যদুপতিবাবু বলেন,

কাজ করবি? বাড়িতে থাকবি, আমার ওখানে! আবার খুন-টুন করে যাবি না তো?

কথাটা পীতু যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বলে সে, কাজ দেবেন, থাকতি দেবেন বাবু? পীতু নস্কর বেইমান নয় বাবু।

যতীন অবাক হয়, বলে সে একে বাড়িতে রাখবেন যদুদা?

যদুপতি বলেন,

একজনকে মানুষ করেছিলাম, সে আজ ঋণ শোধ করছে। এ তার চেয়ে নতুন আর কি করবে যতীন। ওকে আমার ওখানেই নিয়ে যাও।

দেবেনবাবুও অবাক হন—সেকি!

যদুদা বলেন, পথ থেকে একটি ছেলেকে তুলে এনে মানুষ করলাম, লেখাপড়া শেখালাম আজ সেই ছেলেটা যদি আমাদের বোমা মারতে পারে তা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে পথের একটা বোমাবাজ অনাথ ছেলেকেই পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে দেখি সে বদলায় কিনা। জীবন জুড়ে পরীক্ষাই করছি, এটাও করে দেখি যতীন! ওকে মারিস না। নিয়ে চল!

পীতুর চোখে জল নামে। ঠিক এমনি ব্যবহার সে আশা করেনি।

পটলা, লালুরাও অবাক হয়। পটলা তবু গর্জায়

ওই পিনু-বুলুদের দেখে নেব এবার! বোমবাজী ছুটিয়ে দেব!

রমেশ ইরা সেন অন্যরা ভেবেছিল কলকাঠি নেড়ে এই স্কুলের ইলেকশন তারা জিতে যাবে। বিলাসবাবু, পরেশবাবুর মত শিক্ষকরাও ভেবেছিল দেবেনবাবুকে সরাতে পারবে, তাহলে স্কুল হবে তাদেরই জমিদারী।

ভোগ করতে পারবে তারাই, রমেশের দখলদারিতে স্কুল চলবে, রমেশের নামই বাড়বে।

ইরা সেন ভেবেছিল স্কুলের গার্লস সেকশন-এর সেক্রেটারী হবে সে, ক্রমশঃ এই স্কুলকে পঙ্গু করে তার নিজের স্কুলকেই বড় করবে।

কিন্তু রমেশের একটা ভুল চালে সব কিছু ভেস্তে গেল, পিনু, বুলুদের দল অভিভাবক, স্হানীয় লোকদের মিটিং-এ বোম মারতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতে সব খবরই বের হয়ে পড়ে।

অভিভাবক স্হানীয় মানুষরা স্কুলে এই সব জীবদের ঢুকতে দিতে চায় না, অন্ততঃ তারা চায় শিক্ষায়নের বাতাবরণ শান্তই থাকবে, এই বোমবাজীর প্রতিবাদই করে তারা।

তাই সকলেই স্কুলের ভোটে রমেশের দলকে ভোট দেয় না, দু' চারজন ছাড়া। ফলে রমেশের দলের তেমন কেউ জেতে না ভোটে, সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছে নিজে রমেশ।

তাকেও ভোট দেয়নি বহু অভিভাবক। তাই রমেশও হেরে গেছে, এবার স্কুলের সেই পুরানো কমিটির সভ্যদেরই বেশীর ভাগ জয়ী হয়েছে।

যতীনও এসেছে কমিটিতে।

লালু-পটলার দল সমারোহ করে বিজয় মিছিল বের করে।

আজ রমেশ, ইরা সেনের দল দেখে নীরবে ওই শোভাযাত্রা। লালুদের নাচন-কোঁদন। পিনু, বুলুর দল চুপ করে থাকে। রমেশ গর্জায় – তোদের জন্যই এইভাবে হেরে গেলাম। অকর্মার দল। একটা কাজও যদি ঠিকঠাক করতে পারিস।

রমেশ যেন রাগে ফেটে পড়বে আজ। ইরা বলে,

—ডোণ্ট বি এক্‌সাইটেড রমেশ। রিলাক্স। পরে এর জবাব দেবে।

সেই পথের ছেলে পীতাম্বর এখন যদুবাবুর আশ্রয়ে রয়েছে।

সে ভাবতেই পারেনি যে এই মানুষগুলোকে সে বোম মারতে গেছল, অথচ আজ এরাই তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। বেঁচে থাকার পথ করে দিয়েছে।

পীতু যেন এদের জন্য আজ জান লড়িয়ে দিতে পারে। যদুবাবুকে সে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। যতীনবাবুকে সে চিনেছে। আরও অনেকে এখানে আসে।

পীতাম্বর তাদের সেবা করতে পেরে যেন তৃপ্তি পায়।

পীতু দেখেছে লালু, পটলবাবুদেরও।

ছেলেটা এখন যদুবাবুর এখানে আশ্রয়, আহার্য পেয়ে বেশ স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে।

পটলাদের ক্লাবে যায়। ডন বেঠক, লাঠিখেলা, ছুরিখেলা এসবও শিখেছে। পীতুর মনে পড়ে ওই রমেশবাবু, তার দলবল পিনু, বুলুদের কথা।

ওরা তাকে কোন অন্ধকারে ঠেলে দিতে চেয়েছিল, এরা তাকে সেই খুনীর পরিচয় থেকে তুলে এনে বাঁচার আলো দেখিয়েছে।

ওই পিনু, বুলুদের জবাব দেবে পীতু মৌকা পেলেই।

ক্রমশঃ পটলদের আখড়াতেও যায় পীতু।

কিছুদিনের মধ্যে সেই শীর্ণ পীতাম্বর এখন বদলে গেছে। স্বাস্থ্যও বদলাচ্ছে। যদুবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, বাড়ির কাজকর্মেও তেমনি চটপটে।

যতীন আরও অনেকে আসে। যদুপতিবাবুর বৃদ্ধ শরীরে যেন আজ কি নতুন আশা আর উদ্যম এসেছে।

ন্যান গো। চা-চপ এনেছি।

যতীন চাইল পীতুর দিকে।

শুধোয়, কেমন আছিস রে?

পীতু বলে, ভালোই। দাদু এই আপনার চা, আর বিস্কুট। চায়ে চিনি দিইনি কিন্তু। ডাক্তারবাবু মানা করেছে। রুটি আর মাছের ঝোল করছি, খেয়ে বেরুবেন কিন্তু। না খেয়ে বেরুবেন না।

যদুবাবু বলেন, তুই আমাকে সত্যিই শেষ করবি পীতে! বুঝলে যতীন, খাল কেটে কুমীর এনেছি। ব্যাটা চিনি নুন এসব খেতে দেবেনা। বেশ তেলঝাল দিয়ে মাছের ঝাল খাবো, তাও দেবেনা। পেঁপে, কাঁচকলা ঢ্যাঁড়সের ঝোলই খাওয়াচ্ছে। ভাত বন্ধ স্রেফ রুটি।

হাসে যতীন।

পীতু যেন আজ ওই লোকটিকে সেবা করে ধন্য হয়েছে। পীতু দেখেছে এর মধ্যে পিনু-বুলুদের। সেদিন বাজারে গেছে, বুলু ওকে দেখে এগিয়ে আসে।

কি রে ওখানেই থাকবি?

পীতু চেনে ওদের। এতদিন তার পথে পথেই কেটেছে। আজ একটা আশ্রয় করার মত কাজ পেয়ে সে খুশি হয়েছে। পীতু বলে

—কেন?

বুলু পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে বলে,

এটা রাখ, বুড়োর ওখানে কে কে আসে,কি কথা হয় সব দেখে-শুনে রোজ খবর দিবি?

পীতু চিনেছে ওদের। দশটাকার জন্যে তাকে খুনে বানাতে চেয়েছিল।

আজ পীতু জবাব দেয়—ট্যাকার দরকার নাই। উসব কাজ আমাকে দে হবে না।

পীতু দাঁড়াল না।

মুখের উপর জবাবটা দিয়ে গট গট করে এগিয়ে গেল বাজারের দিকে।

বুলু গজরায়, শালা! সাধু যুধিষ্ঠির রে। দোব একদিন সিধে করে।

দেবেনবাবু কথাটা ভেবেছেন। ভোটে এভাবে জেতার পক্ষপাতী তিনি নন। এতদিন স্কুলের এত কাজ করেছেন নিজের কর্তব্য মনে করেই। টাকার কথা ভাবেননি। আজ মনে হয় এ কাজ আর করতে মন চায় না।

বিজয়া স্বামীকে বলে, এত কি ভাবো দিনরাত?

ক'দিনেই দেবেনবাবুর বয়স অনেক বেড়ে গেছে। মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে এসেছে। সদানন্দ মানুষটির মুখের হাসি মুছে গেছে। দেবেনবাবুর মনে এবার ভাবনার কালো মেঘ জমেছে।

বলেন তিনি, ভোটে জিতলেও আর স্কুলের কাজে থাকবো না বড় বৌ। একবার যখন প্রশ্ন উঠেছে, সেখানে নিষ্ঠার আর কোন দাম নেই। ভাবছি সংসার চলবে কি করে? ছেলেটা মানুষ হল না, একটা মাত্র মেয়ে তারও বিয়ে-থা দিতে পারলাম না। এমনি করে দিন, মানুষের মন, তার মূল্যবোধ হারিয়ে যাবে ভাবিনি। তাই আজ বাতিল হয়ে যাবো।

সাবিত্রী শুনেছে কথাগুলো।

বলে সে, একটা স্কুলের কাজ পেয়ে যাবো বাবা। আর দু-তিনটে টুইশানিও নিয়েছি। যেভাবে হোক আমাদের দিন চলে যাবেই। ইচ্ছা না হয় ওখানে কাজ করো না। খেটে প্রাণপাত করেছ অনেক। এবার যা হবার হোক।

দেবেনবাবু মেয়েকে দেখছেন।

সাবিত্রী বলে, ওই গার্লস স্কুলের তো ছাত্রী, ওখানে টিচারের পোস্ট খালি আছে। দরখাস্ত দিয়ে রাখছি।

সাবিত্রী সেখানেও দরখাস্ত দিয়েছে। হয়তো হয়ে যাবে। এছাড়াও আর একটা প্রস্তাব এনেছে গোপাদিদি।

গোপাদি এ পাড়াতেই থাকে। ইরা সেনের স্কুলে চাকরি করে। গোপাদি বলেছে,

ওখানে পোস্ট খালি আছে, দরখাস্ত দে একটা।

সেই দরখাস্তের জন্য ইণ্টারভিউ-এর চিঠি এসেছে সাবিত্রীর কাছে।

দেবেনবাবু কি ভাবছেন।

বিজয়া বলে, মেয়ের উপরই ভরসা করতে হবে এবার!

সাবিত্রী বলে, আমিও তোমাদের সন্তান মা, আমারও কিছু কর্তব্য তো আছে।

বিজয়া বলে, কথাটা তুই বুঝলি মা, লালু তবু বুঝল না। সে পড়াশোনাও তেমন করছে না। দিনরাত ক্লাব, হৈ-চৈ, খেলা এইসব নিয়েই রইল। নিজের ভালো মন্দও বুঝলো না। ওকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছি।

বলে সাবিত্রী, সেও বুঝবে মা।

বিজয়া বলে, ছাই বুঝবে? দিনরাত ক্লাব, এখন ওই ইলেকশন, রাজনীতি নিয়ে মেতেছে। যতীনও তাই করছে।

সাবিত্রী বলে, হয়তো এরও প্রয়োজন আছে মা। অন্যায় তো কিছু করছে না।

কে জানে বাছা। সাবিত্রীর কথার সপক্ষে বিজয়া কোন সদুত্তর খুঁজে পায় না। মনে হয় যেন চারিদিকে একটা ঝড়ই ঘনিয়ে আসছে।

লাইনের ধারে-কাছের জায়গাগুলোতেও এখন বাড়ি উঠছে।

রাতের অন্ধকারে এখন অন্য কাণ্ড চলে। দু'চারটে ট্রাক এসে দাঁড়ায়। ছায়ামূর্তির দল চীৎকার করে—

—বাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিন! এ্যাই শালা—

ওদিকে লাইনের উপর তখন মালগাড়িটা থেমে গেছে, দুমদাম, ঠুংঠাং শব্দ ওঠে।

অন্ধকারে ছায়ামূর্তির দল মালগাড়ির দরজা ভেঙে দামী মালপত্র নামাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ। আবার গাড়ি চলতে থাকে। এরাও ট্রাকে মালপত্র তুলে বের হয়ে যায়। স্তব্ধতা নামে পাড়ায়।

এই কাণ্ড প্রায়ই ঘটে।

সেদিন ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটে যায়। চারিদিকের আলো নেভানো। ট্রাকও এসেছে, ধাবমান মালগাড়িটা থামা মাত্র রেল-লাইনের ধারের ঝোপজঙ্গল থেকে ছায়ামূর্তির দল মালগাড়িতে উঠে দরজা ভেঙেছে, তার পরই স্তব্ধতা খান খান করে কয়েকটা গুলির শব্দ ওঠে। অন্ধকারে বুলেটের নীল আভা ফুটে ওঠে। কার তীক্ষ্ণকণ্ঠের আর্তনাদ ওঠে। বুলু, পিনুরা চমকে ওঠে।

লাইনের ধারের ঝোপে শুয়ে পড়েছে, মাথার উপর দিয়ে কয়েকটা গুলি ছুটে যায় তীক্ষ্ণ শব্দ করে।

ওদিকে কে দৌড়ে পালাচ্ছিল, গুলিটা লাগতেই শূন্যে ছিটকে উঠে গড়িয়ে পড়ল। নীচে পুলিশের গাড়ির হেডলাইট জ্বলে ওঠে। পুলিশ তাড়া করেছে। পালাচ্ছে ওরা।

বুলু চাপা রাগে গর্জায়, ওখানের কোন শালা চুকলি খেয়েছে!

পিনু ঝোপের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে।

লাইনের ধারে ভারি বুটের শব্দ টর্চের আলো দেখা যায়। রেল পুলিশ গুলি করে আজ ওদের দলের দু'তিনজনকে শেষ করেছে। ছড়ানো পড়ে আছে মালপত্র পেটি। লাখখানেক টাকার মাল। আজ আর সেসব পাচার করা গেল না।

আজ পিন্টু-বল্টুদের দল ওইসব কিছু ফেলে রেখে অন্ধকারে জলা, হোগলাবনের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে প্রাণ ভয়ে। এতদিন বিনা বাধায় ওরা এইভাবে লাখ লাখ টাকার মাল পাচার করেছে। নিজেরা কিছু পেয়েছে, কিছু পেয়েছে মহাজন আর রমেশদাও। এমনিই চলছিল। আজ তাদের দলের বিরাট সর্বনাশ করেছে কেউ! এর জবাব তারাও দেবে।

পুলিশ রাস্তায় ট্রাক দুটোকেও ধরেছে। ড্রাইভাররা পলাতক, লাইনেও কাউকে জ্যান্ত ধরতে পারেনি। বাইরের দু'তিনজন ছেলে গুলিতে মরেছে।

সারা এলাকার মানুষ যেন এমনি কোন প্রতিকারই চাইছিল। তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল ওই রাতের হিংস্র প্রাণী-গুলো। আজ সেই মানুষগুলো বের হয়েছে পথে। বলে পুলিশ অফিসারদের, ওদের ঠাণ্ডা করুন মশাই।

এখানে ওদের বসবাস করা অসম্ভব করে তুলেছিল ওই ওয়াগন ব্রেকারদের দল।

পুলিশ বলে, এবার দেখছি ওদের!

তারাও খুঁজছে ওই ওয়াগন ব্রেকারদের, আর পাড়ায়, রেললাইনে পুলিশ পোস্টিং হয়েছে।

সারা এলাকার মানুষ এবার যেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করতে চায়।

যতীন, যদুপতিবাবুরাও এসেছেন এইদিকে। ওখানের পার্কে মিটিং হয়। আজ যতীন বলে, পুলিশ তো আছেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজেদেরও তৈরি হতে হবে। বাধা দিতে হবে।

লালু, পটলা, গোবিন্দরাও এসেছে। এ পাড়ার তরুণদের অনেকে এবার তাদের ক্লাবেও আসছে। একটা সুস্থ প্রতিরোধ তারা গড়ে তুলতে চায়।

বুলু, পিনুর দল এমনি প্রচণ্ড বাধা পাবে এখান থেকে এইভাবে তা ভাবেনি। তাদের দলের তিনজন ছেলে মারা গেছে। পুলিশও পাহারা বজায় রেখেছে লাইনে।

ইরা সেনের পাঁচীলঘেরা বাগানের একদিকে নারকেল বাতাবী-লেবুর ছায়াঘেরা ঝুপড়িতে ওরা ঠেক নিয়েছে। রমেশও আসে এখানে। তাড়া-খাওয়া বাঘ যেমন আশ্রয় নেয় বনে, আর গজরায় ওরাও তেমনি ঢুকে রয়েছে এখানে আর বন্দী বাঘের মত গজরাচ্ছে।

বলে রমেশ, ক'দিন খুব বাড়াবাড়ি করেছিলি তোরা! তাই ঘা খেলি—

পিনু বলে, আমরাও এর জবাব দেব। ওই যদুপতি, যতীনের দলের ভরসাতেই ওখানের লোকজন পিছনে লেগেছিল আমাদের। আমরা সব জেনেছি।

বুলুও গজরায়, দেখে নোব ওদের। আমাদের তাড়াবে?

এদিকে ওদের সাম্রাজ্য বেহাত হতে চলেছে এ খবরও পেয়েছে ওরা।

যতীনের দল ওই লালু-গোবিন্দের নেতৃত্বে এবার বাজারেও এসে তাদের আশ্রয় গেড়েছে। একটা ঘরে ওদের অপিস মত করেছে।

বাজারের ফড়ে ব্যাপারী চাষীর দল এতকাল চুপ করে মুখ বুজে বুলুদের জুলুমে চাঁদা দিয়েছে, তাদের অত্যাচার থেকে এখন রেহাই পেয়েছে ওরা। এখন আর রোজ সেই জুলুম হয় না। বাজারের ব্যাপারী, দোকানদাররা এতদিন ওই বুলুদের ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। আজ তারাও প্রতিবাদ করতে চায়।

এবার তারা ভরসা পেয়েছে।

লালু বলে,

তোমাদের মধ্য থেকেই কয়েকজন অপিসে আসবে, দোকান-

দারদের অনেকে এসেছেন। বাজার কমিটি গড়ে তুলতে হবে। তারাই তোমাদের স্বার্থ দেখবে।

এই ব্যাপারে সাড়া এসেছে। ওদের অনেকেই বলে এবার ওই শালাদের জুলুম থেকে বেঁচেছি বাবু। রোজগারের বেশীটাই ওরা কেড়ে নিত। এখন দুটো পয়সার মুখ দেখছি।

ক'দিনেই আশপাশের চেহারা বদলে গেছে। পুলিশ এখনও খুঁজছে সেই ওয়াগন ব্রেকিংএর দলের নেতাদের।

পিনু, বুলুর দল তাই গা ঢাকা দিয়ে আছে। দলের অন্যান্য ছেলেরাও চুপচাপ রয়েছে। আর সেই অবসরে এসে হাজির হয়েছে লালুদের দল যতীনবাবুদের নেতৃত্বে এতদিনের সেই অন্যায়কে দূর করতে। আর এগিয়ে এসেছে ওই সব এলাকার মানুষ।

বুলুরা গজরায়, এবার দেখব ওই ব্যাটাদের।

রমেশ বিপন্ন বোধ করে। বাজার থেকে রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে।

ওদিকে নবীনবাবু, আগরওয়াল, দরবারা সিংদের মোটা আমদানি হত ওই সব মালগাড়ি লুটপাট থেকে। ইদানিং সেই রোজগার একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

রমেশ বলে দরবারা সিংকে,

তবু এতদিন ওরা তো দিয়েছে অনেক। এখন কিছু দাও ওদের। তারপর দিন বদলাবে, আবার সব পাবে।

দরবারা সিং নগদ কারবার বোঝে। ভবিষ্যতের দিকে তার নজর কমই। দরবারা বলে

আগামীর বাত তখন ফিন্ হোবে রমেশবাবু, এখন পুরা আমদানী বন্ধ, কত আর দিব ? লিন্ কিছু।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন দয়া করে সামান্য কিছু টাকা দিল ওদের। দরবারা বলে

এখন পাবলিক লোগ্ ভি বহুৎ হুঁসিয়ার হোয়েছে, উ কাজ কারবার এখন চলবে না।

আগরওয়ালা বলে, যাতে চলে তার ব্যবস্থা করতে হবে সিংজী। ওসব চেষ্টা করছি।

নবীনবাবু সায় দেন—ব্যবসায় জোয়ারভাটা আছে সিংজী, ফিন আবার পথ করতে হবে। পুলিশ চুপ মেরে যাবে—পাবলিক লোক তো ভেড়ার পাল। দু ধমকানি দেবে, বোম চালাবে থেমে যাবে।

দরবারা ভাবছে কথাটা।

বলে সে, দেখুন শোচ-সমঝকে কি হোয়! এই ব্যবসায়ীর দল নিজেদের লাভের জন্যই বুলু, পিনুদের ওয়াগন ব্রেকার বানিয়েছিল। আর রামশের দরকারে লাগতো এই গুণ্ডার দল, তার দলের জন্য চাইতো, কিছু আমদানীও করে দিত। আজও রমেশের ওদের দরকার। আজ তার প্রাধান্য বিস্তার করতেই হবে, তাই ওই অন্ধকারের পথে, হিংসার পথেও এগোবে প্রয়োজন হলে। অন্তত একে ঠেকাতে সংগ্রাম করতে হবে ওদের, সে সংগ্রামও হয়তো রক্তঝরা সংগ্রামই হবে। রমেশ তার জন্যই তৈরি হচ্ছে।

ইরা সেন বলে, তুমি সত্যি পারবে রমেশ।

রাত্রি নামে। ইরা সেন দু-এক পেগ মদ খায়, রমেশ ইদানিং উত্তেজনা চাপতে মদ খায়। রমেশের চোখে কি মাদকতার নেশা। ঘরের নীলাভ আলোয় ইরা সেনের মাঝবয়সী দেহটাই তার মনে কি সাড়া আনে।

রমেশ ইরা সেনকে কাছে টেনে নেয়। ইরা সেনের কাছে পুরুষের স্পর্শ নতুন কিছু নয়। অনুভব করে সে রমেশের সারা দেহে মনে কি উত্তেজনার ঝড় উঠেছে। ইরা সেন ওর নিবিড় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলে ঃ

—সাবিত্রীকে চাকরি দেব ভাবছি তোমার জন্যেই।—সাবিত্রী।

রমেশের দুচোখে সেই নিটোল যৌবনবতী মেয়েটির রূপ ফুটে ওঠে।

আজ রমেশ যেন বিচিত্র কি স্বপ্ন দেখছে।

ইরা সেন ওর গালে আলতো ভাবে আদর করে বলেঃ—কি খুশি তো! তারপর যেন ছেলেমানুষি কিছু কর না। দিন দিন যা হচ্ছো তুমি। স্কুলের ইলেকশান-এ এভাবে হেরে যাবে আশা করিনি রমেশ।

যদুপতিবাবুর আশ্রয় থেকে বের হয়ে এসে রাজনৈতিক সামাজিক জীবনে এই তার প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু সারা এলাকার মানুষ এই ভাবেই তার প্রতিবাদ করবে তা ভাবেনি। ওই ওয়াগন ব্রেকিং—বাজারে ফড়েদের উপর অত্যাচার, যদুপতিবাবুকে ফেলে আসা, মিটিং-এ বোম চার্জ করার ব্যাপার সবই রমেশের বিরুদ্ধে যাবে এভাবে তা ভাবেনি।

বিশ্বাস, নরেশবাবুর দল চুপ করে গেছে। রমেশ দেখেছে যদুপতিবাবুরাই জয়ী হয়েছেন সগৌরবে, দেবেনবাবু রয়েছেন ওই আনন্দ উৎসবে। রমেশ আজ মাথা নীচু করে বের হয়ে এল।

পটলার দলবল আশেপাশেই ছিল। আর রয়েছে পীতু, যদুবাবুর কাছাকাছি। কালো চেহারায় এখন গত্তি এসেছে।

পটলা কোত্থেকে একটা কোল্ড ড্রিংকসের বোতল এনে দেয় রমেশকে, নিন রমেশদা। গলা ভিজিয়ে যান।

রমেশ দেখছে পটলাকে। পীতুও এসেছে। রমেশ কোন রকমে বোতলটা শেষ করে বের হয়ে এলো। সারা মনে ওর আগুন জ্বলছে। আজ দেখেছে সে ওই দলের মানুষদের!

ইরা সেন চুপ করে আছে। এ যেন তারও অপমান।

তবু এরা নকুলের বাৎসরিক উৎসবে এসেছে, জানাতে চায় ইরা অন্যরা যে এই ইলেকশনে তারাও খুশি হয়েছে, তাই শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে।

এসেছে আগরওয়াল, দরবারা সিং, নবীনবাবুও। আগরওয়াল হতাশই হয়েছে।

স্কুলের ওই জায়গাটা সে আর হাতাতে পারবে না, দরবারা সিংও ভাবছে কথাটা। আড়ালে বলে সে।

ইস্কুলেই হেরে গেলে রমেশজী, ক্যায়সে কর্পোরেশনের ভোটে রিটার্ণ করবেন, তারপর এম-এল-এ ভোট! শোচলাম আপনাকে ব্যাক করলে ফায়দা হোবে, লেকিন ক্যা ভরসা?

ফণীবাবুও এসেছে। এ পরাজয় এদের সকলের স্বার্থে কঠিন আঘাত হেনেছে। রমেশ ভাবছে কথাটা।

নবীনবাবু বলে, তিনটে ভোট বাতিল করেনি, আমি কেস করব ভাবছি। এ ইলেকশান নাকচ করতে হবে।

ইরা সেন বলে, ওতে লাভ হবে না। ওদিকে এবার কর্পোরেশনের ইলেকশানেও দাঁড়াচ্ছে যদুপতিবাবুর দলের লোক সবক'টা ওয়ার্ড থেকে। আপনাদের সবাইকে হারাবে।

ফণীবাবুও বিপদে পড়েছে।

ইরা সেন বলে, মরা হাতিই সওয়ালাখ, বুড়ো যদুপতিই এখনও সর্বেসর্বা। তুমি ওকে ঝরাপাতা মনে করে ফেলে এসে ভুলই করেছ রমেশ।

দরবারা সিং বলে

ভাবছি যদুপতিবাবুর কাছেই যাব। গ্যারেজের লাইসেন্সভি করতে হবে, চলি।

দরবারা সিং কেন আগরওয়ালা, নবীনবাবুরাও ঘাবড়ে গেছে। ফণীবাবুও ভাবছে এবার রমেশকে সঙ্গে রাখবে কিনা।

রাত হয়েছে। ইরা সেন আর রমেশ বসে আছে। ওরা চলে গেছে।

আজ রমেশের চোখের সামনে যদুবাবু যেন একটা বিরাট

পর্বতের মত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওকে না সরাতে পারলে রমেশ শেষ হয়ে যাবে। তার পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

রমেশ আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে।

ইরা সেন বলে, কি ভাবছ রমেশ? বুড়ো যদুপতি তোমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

রমেশ কি ভাবছে। এবার একটা পথ তাকে নিতেই হবে। রাত নেমেছে।

পিনু, বুলুরাও মরীয়া। দিন বদলাতে হবে। অন্য একটা বড় কিছু না ঘটাতে পারলে তাদের উপর থেকে পুলিশের নজর যাবে না।

রমেশও ভেবেছে কথাটা।

আশেপাশে শহরের এখানে-ওখানেও বিভিন্ন জেলায় অনেক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে। দেশে নতুন এক রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটছে। এতদিনের পুঞ্জীভূত অন্যায় অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আজ কি জ্বালা নিয়ে ফেটে পড়েছে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে দিকে দিকে। রমেশ ভাবছে কথাটা। তার কাছে ন্যায়-অন্যায় বলে কোন কথা নেই। তার বিবেকবোধও স্বতন্ত্র ধরনের। রমেশ ভাবছে এবার চরম পথই নিতে হবে তাকে। এই হবে তার শেষ লড়াই। নিমু বুলুদেরও বাঁচতে হবে। তাই রমেশের কথায় পিনু, বুলুর দলও সায় দেয়।

বলে তারা, যাহোক একটা কিছু করতে হবে রমেশদা, নাহলে টেকা যাবে না। রমেশও সেটা বুঝেছে।

শান্ত জনপদ। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের দল দিনান্ত পরিশ্রম করে কোন রকমে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। নিরীহ অপিস-যাত্রীর দল সকাল থেকে ব্যস্ত। তাদের সীমিত পরিবেশে সামান্য নিয়েই তৃপ্ত তারা। সমাজের বুকে তারা সকলেই তবু

শান্তিতে বাঁচতে চায়। অভাব-অভিযোগ-দাবিকেও তারা শান্তি-পূর্ণ ভাবে জানাতে চায়, তার সমাধান করতে চায়।

তাই এসব এলাকার সাধারণ জীবনযাত্রা অনেকটা শান্ত ঢিলেঢালা। স্কুলের ইলেকশানে দু'একদিন উত্তেজনা কিছুটা এসেছিল, আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

যদুপতিবাবু স্কুলে আসেন। নতুন বিল্ডিং হয়েছে। দেবেনবাবু বলেছিলেন, এবার আমাকে ছুটি দিন যদুদা।

স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান যদুপতিবাবুও অন্য সকলেই বলেন না, এখন ওসব কথা কেন বলছেন দেবেনবাবু ?

দেবেনবাবু দেখছেন পরিবেশটা তবুও বদলে গেছে। স্বার্থের বিষ এমনই, একবার যেখানে সেই শিকড় গজিয়ে ওঠে সেখানে বিরোধ কিছুটা রয়ে যায়। বিশ্বাসবাবু, নরেশবাবুর দল কাজ করছে, ক্লাশও নেয়। তবু দেবেনবাবু দেখছেন সেই প্রীতি, সহযোগিতা আর নেই। আড়ালে তারাও কয়েকজন মিলে কি গোপন আলোচনা করে।

সেদিন সাবস্টাফদের মধ্যেও একটা আন্দোলন হয়ে গেল। তাদের দলের পাণ্ডা হয়ে এসেছিল নৃপতি ঘোষ, সেও হরিহর-ভূপেনবাবুর দলেরই। দেবেনবাবু দেখছেন এদের গোপন ব্যাপারটা। স্কুলের শান্ত সুন্দর পরিবেশের অতলে ধীরে ধীরে একটা উত্তাপ সংক্রামিত হচ্ছে। যে কোন দিন তা বিস্ফোরণে পরিণত হবে।

দেবেনবাবুর কাছে এইগুলো ভাল ঠেকছে না। তাই যদুবাবুকে কথাটা জানাতে যদুবাবু বলেন

যে ক'দিন আছি তুমিও থাক দেবেন। নাহলে এই প্রতিষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে। তারপর যা হয় হোক দেখতে আসবো না।

দেবেনবাবু বলেন, যদি সাধারণ মানুষ তাই চায় আমরা চলে গেলেও সেটাই হবে। তবে বাধা দিয়ে কি লাভ ?

যদুবাবু বলেন

সাধারণ মানুষ তা চায় না দেবেন। তাহলে তারা এখানে বাধা দিত না। কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে এসব করতে চায়, কিন্তু তারা সংখ্যায় খুবই কম। আমাদের কাজ হবে তার প্রতিবাদ করা। তুমি এসব কথা ভেবো না। স্কুলের কাজ চালিয়ে যাও।

যদুবাবু এখনও কর্মঠ। সামনে কর্পোরেশনের নির্বাচন।

যতীনকে তিনি রাখতে চান এসেমব্লী ইলেকশানের জন্য। যতীন তার যোগ্য প্রার্থী কর্পোরেশন ইলেকশানে নাম দিতে বলেছেন ভূদেবকে।

বেলা হয়ে গেছে।

শহরতলীর সকাল শুরু হয় বাজারের ভিড় দিয়ে, তারপরই শুরু হয় অফিস যাত্রীদের ভিড়। তখনও কিছু ভিড় রয়েছে। সাইকেল রিক্সার হর্ন বাজে, লোকজন ওই সরু সাবেকী রাস্তায় ভিড় বাঁচিয়ে চলেছে। পীতু রয়েছে সঙ্গে। যদুপতিবাবু চলেছেন অন্য পাড়ায়, সেখানে কর্পোরেশনের নতুন রাস্তার কাজ হচ্ছে। যদুপতিবাবু নিজে এখনও সব দেখাশোনা করেন। হঠাৎ শান্ত পরিবেশে পরপর দুটো বোমার শব্দ ওঠে। কেঁপে ওঠে চারিদিক।

কলরব, ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

তারপরই দেখা যায় যদুপতিবাবু রিক্সা থেকে ছিটকে পড়েছেন, মুখে বুকে গভীর ক্ষত। রক্ত ঝরছে। রাস্তার ধারে পড়ে আছে রক্তাক্ত জ্ঞানহীন দেহটা, পিতুও আহত। ওর কাঁধে বেশ চোট লেগেছে, তার দেহটা রিক্সায় পড়ে আছে। রিক্সাওয়ালাও চোট পেয়েছে।

ভিড় জমে যায়।

সারা এলাকায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। যতীন, ভূদেব, লালু, গোবিন্দ, পটলার দল, সারা অঞ্চলের মানুষ ছুটে আসে।

দেবেনবাবুও এসেছেন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

খবরটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়।

এলাকার মানুষজনও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।

শান্ত নিউটাউনের সেই শান্তির বাতাবরণ আজ কলুষিত হয়ে গেছে।

দেবতুল্য—অজাতশত্রু মানুষ এই যদুপতি।

মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, নিঃস্বার্থভাবে এতদিন মানুষের জন্য কাজ করেছেন।

আজ সেই মানুষটিকে কারা এইভাবে আঘাত করেছে।

হাসপাতালে আনা হয় যদুবাবুকে।

এসেছে যতীন, যাদব, লালুর দল। দেবেনবাবুও।

রক্ত দিতে হবে। তার জন্য লোকের অভাব নেই।

ডাক্তাররাও চেষ্টা করছেন যদুবাবুকে বাঁচাবার জন্য। এসেছে ওই ভিড় ঠেলে রমেশও।

রমেশ এর দিকে চাইল এরা সবাই।

জানে এই রমেশকে। আজ রমেশ যেন অন্য মানুষ। বলে সে—যদুবাবুকে যারা এই ভাবে আঘাত করেছে তাদের খুঁজে বের করবোই। এই এলাকায় তাদের ঠাঁই হবেনা। রক্ত দিতে হয় আমিও দেব।

যতীন দেখছে রমেশকে।

লালু, গোবিন্দের দল ও চুপ করে থাকে। তাদের মান যেন বেড়ে উঠেছে।

রমেশকে অবশ্য রক্ত দিতে হয় না।

যদুবাবু তার রক্ত নিতে বোধ হয় চাননা। তাই চলে গেলেন তিনি ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে।

আজ সেই দেবতুল্য মানুষটি জীবনে ভালমানুষির চরম মূল্য দিয়ে গেলেন।

সারা হাসপাতালে স্তব্ধতা নামে।

সেই শোকের ছায়া নামে সারা শহরের মানুষের মনে। এই শান্ত মানুষগুলোর আপনজনই আজ চলে গেল। কোন অশুভ শক্তি যেন নিজেদের দখল কায়েম করার জন্যই যদুবাবুকে সরিয়ে দিল এই অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর মাটি থেকে।

পীতু আর রিক্সাওয়ালা ছেলেটা হাসপাতালে রয়েছে। ওরা মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে, যদুপতিবাবু আর বেঁচে নেই। দীর্ঘ বৎসরের রণক্লান্ত সৎ সর্বত্যাগী মানুষটিকে নিষ্ঠুর মৃত্যু তাদের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

সারা অঞ্চলে এই ঘটনাটা একটা ঝড় তোলে। এইভাবে কোন হত্যাকাণ্ড এখানে ঘটেনি। আর কোন নিষ্ঠুর হত্যাকারীর দল যদুবাবুর মত শ্রদ্ধেয় অজাতশত্রু লোককে হত্যা করে যেন ঘোষণা করতে চেয়েছে যে তারা সবকিছু সুস্থ মানবিকতাকে এই ভাবেই শেষ করবে নিজেদের স্বার্থে।

পুলিশ এসেছে।

রাস্তার ধারের দোকানদার, আশপাশের বাড়ির ছেলেদের তারা তুলে নিয়ে গিয়ে তদন্তের নামে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে সারা এলাকায়।

যদুপতিবাবুর মৃতদেহটাকে ফুলে ফুলে ঢেকে ট্রাকে করে এনেছে তারা।

স্কুল আজ বন্ধ। বন্ধ হয়েছে বাজার, বাজারের সব কেনা-বেচা। পাড়ার দোকানপাটও বন্ধ।

দেবেনবাবুর চোখে জল নামে, যতীন, ভূদেব, লালুরাও রয়েছে।

এসেছে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে আগরওয়াল, নবীনবাবু, দরবারা সিং, আরও অনেকে। সারা শহরের মানুষ এই মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে। জনস্রোত নামে পথে। এরা যদুবাবুর মৃতদেহ নিয়ে চলেছে, বহু মানুষ ফুলও চোখের জলে বিদায় জানায় তাঁকে। ফুলের মালা এনেছে, দরবারা সিং নিজে ট্রাক দিয়েছে ওঁকে আনার জন্য, রমেশও এসেছে।

খালিপায়ে সেও আজ এসে ওই শোকযাত্রায় সামিল হয়েছে। সারা এলাকার মানুষের চোখে জল। যদুপতিবাবু প্রাণ দিয়েছেন কিছু অমানুষ বর্বরের হিংস্রতার কাছে। আজ সকলেই চায় সেই হত্যাকারীদের ধরা হোক, শাস্তি দেওয়া হোক।

লেবুবাগান মাঠে সন্ধ্যায় লোকসভার আয়োজন করা হয়েছে। সারা এলাকার লোক, মেয়েরা অবধি এসেছে। দেবেনবাবু বলতে উঠে আবেগভরে দু-চারটে কথা বলার পর ভেঙে পড়েন।

বলেন, হত্যাকারীদের শাস্তি চাই! তাদের থামাতেই হবে। মানবিকতাকে, সত্যকে, ন্যায়কে হত্যা করার কাজই শুরু হয়েছে। একে বাধা দিতেই হবে, যদুদার, আত্মা তবেই শান্তি পাবে।

যতীন-ভূদেবরাও স্মৃতি তর্পণ করে।

উঠেছে রমেশ, সে আজ অন্য মানুষ।

বলে, যদুপতিবাবু আমার কাছে পিতৃতুল্য। তিনি আমার গুরু। আজ তাঁকে যারা হত্যা করেছে তাদের খুঁজে বের করতেই হবে। আমার বিশ্বাস এ সেই ভ্রান্ত যুবকদলেরই কাজ যারা দেশ থেকে সব আদর্শকে মুছে ফেলতে চায়।

লালু, গোবিন্দ, পটলা আরও কিছু তরুণরা চুপ করে বসে নেই। তারা এর মধ্যেই খবরাখবর নিতে শুরু করেছে। ওই ঘটনার আগে দুচারজন ছেলে, দোকানদার, ওখানে বুলু, পিনুদের

দেখেছিল। কিছু অচেনা ছেলেও ছিল তাদের সঙ্গে।

বুলু পিনুর দল সেই ওয়াগন লুটের পর থেকেই গায়েব হয়ে গেছে, তাই হঠাৎ ওদের দেখে অনেকেই অবাক হয়। পুলিশের হুলিয়া রয়েছে ওদের নামে, তবু ঘুরছে ওরা।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ অবশ্য ধরেছিল জনা পঞ্চাশ বুড়ো-বুড়ি, কচি কাঁচাকে। তাদের তদন্ত এখনও শেষ হয়নি।

লালু বলে—পটলা, পিনু বুলুদের খবর নিতেই হবে। ওদের হাত নিশ্চয়ই আছে। আর পুলিশ দুটো না ফাটা বোমাও পেয়েছে। ওদের মাল পেলে বোঝা যাবে কাদের কাজ।

আজ রমেশকে উদাত্ত স্বরে বক্তৃতা দিতে দেখে দুচার জন বলে-বেইমান কুকুরের ল্যাজ নাড়া দেখছিস ?

বিশ্বাসবাবু, নরেশবাবু—নৃপতি স্কুলের অনেকেই আসার রয়েছে।

আজ ওরা মনে মনে খুশি হয়েছে। যদুপতি চলে গেছে, তাদের পথ এবার পরিষ্কার হয়েছে। ওরা রমেশের বক্তৃতার সময় ওই মন্তব্যকারীদের দেখছে। চিনে রাখছে রমেশ ওই মন্তব্য-কারীদের। এবার সে এক এক করে ওদের জবাব দেবে।

রাতে ইরা সেনের সুরক্ষিত বাড়িতে এদের বৈঠক বসে। রমেশ মদ খাচ্ছে শান্তিতে। খুশি সে, হাসছে ইরা সেন। এখন তার অন্য রূপ। রমেশ রয়েছে। ইরা বলে

খাসা চাল চেলেছ রমেশ। এক চালে কিস্তী মাৎ করেছ। যদুপতিবাবুকে সরালে, এবার দ্যাখ ঠিক মত জাল গুটিয়ে তুলতে পার কিনা।

রমেশ আজ ক্লান্ত। তাই ক্লান্তি দূর করার জন্য দু'এক পেগ হুইস্কি সে খায়।

ইরা সেনের কথায় বলে, আরে যদুপতিবাবুকে খুন করেছে ওই চরমপন্থীরা। খুনের রাজনীতি আমরা করি না।

ইরা বলে, কথাটা অবশ্য তাই রটেছে। দেখছি তোমরা পারো সব। রমেশ বলে

ওটাই রটুক। ফাঁক থেকে আমরা এবার আসরে অবতীর্ণ হচ্ছি। তার আগে একটু কাজ আছে। কিছু টাকার দরকার ইরা।

ইরা চাইল।

আজ রমেশের কাছে ইরা যেন আটকে গেছে। যদুপতিবাবুকে কৌশলে সরিয়ে দেবার ব্যাপারে ইরাও জড়িত। রমেশ আজ তাকে সেই জালে আরও বেশি করে জড়িয়ে যেন নিজের কাজ আদায় করতে চায়। ইরা জানে সেই হত্যাকাণ্ডের নায়করা আজও তার এখানেই রয়েছে। যদি কোন ভাবে সেই খবর বের হয়ে পড়ে তাহলে ইরা সেনকে ওই জনতা ছাড়বে না। আজ দেখেছে যদুপতিবাবুর মৃত্যুটা কি ভাবে আঘাত করেছে এখানের মানুষের মনে।

ইরা শুধোয়, কেন? টাকা তো সেদিন দিলাম।

রমেশ বলে

পিনু, বুলুরা এখন এখানে রয়েছে। ওই কাণ্ড করার পর যদি কেউ দেখে থাকে খবরটা বের হয়ে যাবে। আর যদি জানতে পারে ওরা এখানেই রয়েছে তাহলে আর বাকি থাকবে না সর্বনাশের, তুমিই বিপদে পড়ে যাবে। তাই ভাবছি কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ওদের সরিয়ে দিই বাইরে কিছু দিনের জন্য, তারপর সব চুপচাপ হলে ওরা ফিরবে।

ইরা ভাবছে কথাটা।

তাকে যে ভাবে হোক দায়মুক্ত হতেই হবে। আজ তাই বাধ্য

হয়ে ইরা সেন আলমারি খুলে হাজার কয়েক টাকা তুলে দেয় রমেশের হাতে। ইরা সেন দায়মুক্ত হতে চায়।

পিনু, বুলুরা বেশ গোপনে আর কৌশলেই কাজটা সেরেছে। কেউ টের পায়নি। ওই এলাকার গলি-খুঁজি সব তাদের চেনা।

ওদিকে তাদের দলের দুচার জন রয়েছে। বুলু পিনু আগে থেকেই সব খবরাখবর নিয়ে তৈরি ছিল। যদুবাবুকে আসতে দেখে গলির মধ্যে থেকেই কয়েকটা বোমা ঝেড়ে সরে পড়েছে গলি দিয়েই। তারপর এ পথ ওপথ ঘুরে এই বাগানবাড়ির গোপন আস্তানায় এসে হাজির হয়েছে।

বুলুর মন থেকে তবু উত্তেজনাটা যায়নি। এরা এই প্রথম খুন করলো। রমেশ যেন এদের নতুন পথে ঠেলে দিয়েছে নিজের স্বার্থে।

বুলু পরে ভেবেছে কথাটা। দেখেছে জনস্রোত। বুলু বলে,

—খামোকাই বুড়োটাকে ঝাড়লাম বিনাদোষে!

পিনু বলে,—কেন দুঃখ হচ্ছে? রমেশদাকে ওই ব্যাটাই সাবাড় করে দিত। ওই যতীনবাবু লালু পটলার দলকে মাথায় তুলেছিল। যদুবাবু, বাজার এলাকা দখল করে নিল। ওয়াগন ব্রেকিং বন্ধ করে দিল। ছেড়ে দেব?

বুলু বলে, কিন্তু লাভ হল তাতে কিছু?

পিনু হিসাবী ছেলে।

· এর মধ্যে দুটো দিশী মদের পাঁইট আর রাস্তার ধারের দোকানের কষা মাংস রুটিও এসেছে। ঝাল মাংস চিবোতে চিবোতে পিনু বলে,—লাভ হবে বৈকি। এবার রমেশটা ঠেলে উঠছে। এবার ও ভোটে জিতবে, তখন দেখবি আবার ওই বাজার থেকে লালু-পটলাদের হটাবোই। আবার ওয়াগন ব্রেকিং এর কাজ

শুরু হবেই।

বাইরে কার পায়ের শব্দ পেয়ে বুলু লাফ দিয়ে ওঠে। পিনু হাত ঢুকিয়েছে প্যাণ্টের পকেটে, মালপত্র ওদের সঙ্গেই থাকে। রমেশকে দেখে চাইল ওরা।

—তুমি। রমেশদা! কি ব্যাপার?

রমেশ ওই হিংস্র জীবদের নিয়ে ঘর করছে। বলে সে,—খবর পেলাম যতীনবাবুরা ওই লালু-পটলার দল নাকি খবর পেয়েছে তোরা এখানে আছিস। ওরা রেড করতে পারে তাই ছুটে এলাম। পাঁচশো টাকা সঙ্গে রাখ, গাড়ি দিচ্ছি। রাতারাতি কোথাও চলে যা। দরকার পড়লে খবর দিবি টাকা পেঁীছে দেব। তারপর সুনসান্ হলে ফিরবি। এখন এখানে থাকা ঠিক হবে না।

কথাটা যুক্তিযুক্ত।

রমেশ-এর কথাগুলো শুনে চমকে ওঠে বুলু, পিনুরা। রমেশই সেই রাতে ইরা সেনের বাড়িতে তাদের ডেকে এনে বেশ কিছু টাকা দেয়। মদ-মাংসও খাওয়ায়।

তারপর রমেশ জানায় পরদিনই গোপনে ওই যদুবাবুকে শেষ করতে হবে। কেউ যেন জানতে না পারে।

বুলু অবাক হয়—বুড়োটাকে মারবো?

রমেশের দরকার এবার পথ পরিষ্কার করার।

যদুবাবুকে হঠাতেই হবে, নাহলে যদুবাবু ওই যতীন, অন্যদের নিয়ে এখনও এখানে তার আধিপত্যই বজায় রেখেছে।

স্কুলের ইলেকশনে হেরে গেছে রমেশের দল। রমেশের হাত থেকে সাবিত্রীকেও কেড়ে নিয়েছে ওই যতীন। এখন তাকেই যদুবাবু রমেশের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করে এম-এল-এ নির্বাচনেও লড়তে চায়।

জানে রমেশ যদুবাবুই জয়ী হবে। হেরে যেতে হবে

রমেশকে। আর এবার হারলে রমেশকে রাজনীতি থেকে সরে যেতে হবে চিরদিনের জন্য।

রমেশ কিছু হারাতে চায় না। তাকে সবকিছু পেতে হবে। জিততে হবে জীবনের লড়াই-এ। পথে পথে নিঃস্ব হয়ে ঘোরার যন্ত্রণা সে জানে।

তাই আর হারতে চায় না। সেইজন্যই জিততে হবে তাকে।

তাই যদুপতিকেই সরিয়ে দেবে সে।

বুলুর কথায় রমেশ বলে,

—তোরা মারবি কেন? তোরা কাজ শেষ করে গা ঢাকা দিবি। দরকার হলে এই ইরা সেনের গুদামেই এসে সেলটার নিবি। সবাই জানবে মেরেছে অন্যদল। নকশালদের নামই রটিয়ে দেব। সবাই জানবে এই এলাকাতেও ওরা এসে পড়েছে। ওসব নিয়ে ভাবিস না। কালই—

রমেশদাকে চটাতে পারে না বুলুর দল।

রমেশ অবশ্য বলে—আর যদি না পারিস তাহলে বল—অন্য কারো কথাই ভাববো।

অর্থাৎ রমেশ তাদের চাপও দিচ্ছে।

বুলুরা জানে রমেশদাকে চটালে বাজারের মোটা রোজগার, ওয়াগন ভেঙ্গে মাল সরাবার দরুন আয়টায় সবতো বন্ধ হবেই। উল্টে পুলিশই তাদের অ্যারেষ্ট করে দু-পাঁচটা কেসে জড়িয়ে শ্রীঘরে পুরে দেবে।

তাই ওই কাজটি করেছিল তারা বাধ্য হয়ে।

ওই বোমবাজীর ব্যাপারটা খুব সাবধানেই করে সরে এসে বুলুর দল এখানে আশ্রয় নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

রমেশ জানে ওই যতীনবাবু কলকাতার উপর মহলে চাপ দিচ্ছে যদুবাবুর খুনীদের ধরার জন্য।

এদিকে লালু, পটলদের দলও খুঁজছে বুলু, পিনুদের।

তারাও দু'একজনের মুখে আসল হত্যাকারীদের খবরও পেয়েছে।

তারাও খুঁজছে বুলু, পিনুদের।

রমেশও বেশ জানে ওই বুলু পিনুদের এখন সরাতেই হবে। কারণ ওদের যদি ধরে ফেলে পুলিশ, তাহলে রমেশ, ইরাও ফেঁসে যাবে। রমেশের কেরিয়ারও শেষ হয়ে যাবে।

আর বুলু, পিনুদের বেঁচে থাকাটাই তার পথে বিপদের। আজ নয়, পরেও বুলু পিনুর দল তাকে কায়দায় পাবে।

রমেশ জানে লালুর দল এদিকে-ওদিকে ওৎ পেতে আছে। রাতের অন্ধকারে বুলু, পিনুদের পেলে তারাই শেষ করে দেবে ওদের। রমেশেরও বিপদ কেটে যাবে।

নতুন দল নিয়ে কাজ করবে রমেশ, যদুবাবু হত্যার কাহিনীও লোকে ভুলে যাবে।

বলে রমেশ—চলে যা কাশী না হয় অন্য কোথাও। বুলু, পিনুরাও সরে যেতে চায় এখান থেকে কিছু দিনের জন্য।

এখন হাওয়া গরম।

পাবলিকও ক্ষেপে আছে।

তাই সরে যাওয়াই উচিত।

পিনু গজরায়—পালাতে হবে?

রমেশ বলে—যতীন কলকাতার কর্তাদের চাপ দিচ্ছে তোদের ধরার জন্য। এখানের দারোগাও তাই বললো।

পিনু গজরায়,—তাহলে বুড়োটাকে ফাঁসিয়েছি, যতীনকেও ফাঁসিয়ে দেব।

রমেশ তাই চায়।

তবে সে সময় এখনও আসেনি। এখন এদের দায়মুক্ত হতে হবে তাকে।

তাই রমেশ বলে,

—এখন ওসব থাক। সরে যা, সব ব্যবস্হা করে রেখেছি।

রাতেই বেলাতেই চলে যা এখান থেকে। টাকাটা রাখ। পরে দরকার হলে—খবর দিবি ওই আগরওয়ালের কলকাতার অফিসে, টাকা যাবে।

ওরা সরে যাওয়াই নিরাপদ মনে করে রাজী হয়ে যায়। বুলু, পিনুদের রাজী হতে দেখে রমেশও খুশি হয়। বলে রমেশ—তোরা তৈরি হয়ে নে। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করছি।

ইরা সেনও ওই দুটি মালকে এখানে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর দেখেছে সারা এলাকার মানুষের ওই প্রতিবাদ।

তাতেই ঘাবড়ে গেছল ইরা।

রমেশকে বলে—সরাও ওদের। কোনমতে কেউ জানতে পারলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে রমেশ। আমিও মরবো, সঙ্গে তুমিও। হঠাও ওদের।

আজ ওদের হঠাবার ব্যবস্থা করেছে রমেশ। ইরাকে বলে—হাজার পাঁচেক টাকা দাও, ওদের তাড়াই।

ইরা তাই দেয়। বলে—তাই দিচ্ছি। হঠাও ওদের, এই রাতেই।

রমেশ টাকাটা নিয়ে এদের হাজার তিনেক দিয়ে নিজের পকেটে রাখে বাকী টাকাটা। ইরা-পিনুর দল অবশ্য এই কমিশন কাটার খবরটা জানতে পারে না।

গাড়ির ব্যবস্থা আগেই করেছিল রমেশ। একটা ভাড়াগাড়িতে ওদের দুজনকে তুলে দিয়েছে, গাড়িটা রাতের অন্ধকারে বের হয়ে গেল গেট দিয়ে।

রমেশও নিশ্চিন্ত হয়। ইরা সেন দূর থেকে ব্যাপারটা দেখেছে, সেও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

লালু-পটলা-গোবিন্দের দল কিন্তু নজর রেখেছিল এই বাগান

ঘেরা বাড়িটার উপর সন্ধ্যা থেকেই। তাদের সন্দেহ হয়েছিল আগেই।

ইরা সেনের বিস্তীর্ণ পাঁচীল ঘেরা এলাকার একদিকে বড় রাস্তা এয়ারপোর্ট হয়ে শিলিগুড়ি রোডে মিশেছে।

এদিকে এখন শহরের দখলদারী এগিয়ে আসেনি। গেটটা সব সময় বন্ধ থাকে এবাড়ির গেটে সকলের প্রবেশ নিষেধ।

তবু লালুরা জানে রমেশ এখানে প্রায়ই আসে। নানা রকম আড্ডা হয়। এখানে দু-চারটে বাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, আর একটা ধাবা গড়ে উঠেছে ওদিকে।

পাঁচীলের পিছনে এখনও জলা. কিছু ঝোপঝাড় রয়েছে। পটলা ধাবাতেই বসেছিল। ওখানে সন্ধ্যার পর দেশী মদও মেলে।

ইরা সেনের বাগানের দারোয়ানকে দুটো দেশী মদের বোতল আর দো-আদমীকা লিয়ে চাপাটি আর মাংস নিয়ে যেতে দেখে সন্দেহ হয় লালুদের।

লালু ওদিকে রয়েছে।

পটলা বলে, দো-আদমীর জন্য চাপাটি মাংস আর মদ গেল রে!

গোবিন্দ সব শুনে বলে,—জরুর এখানেই আছে ব্যাটারা। রাত হলে পাঁচীল টপকে ভিতরে যাবো। দেখি কিছু খবর মেলে কি না।

লালু বলে, একা যাবি! যদি ওরা দেখতে পায় তোকে?

গোবিন্দ বলে, যে শালা গবাকে মারবে সে এখনও মায়ের গব্বে আছে, বুঝলি!

রাত হয়ে গেছে। পথে দু-চারটে গাড়ি বেগে বের হয়ে যায়। পাঁচীলের আড়ালের বাড়িটাতে রাতের স্তব্ধতা নামে।

হঠাৎ একটা খালি গাড়িকে ঢুকতে দেখে চাইল লালু? ভাড়ার

গাড়ি ভিতরে গেল।

পটলা বলে, নির্ঘাৎ গাড়িটা বের হবে। ওতেই পালাতে পারে শালারা! ওখানেই রয়েছে ব্যাটারা।

লালু বলে, আরও দু-চারজনকে খবর দে। গাড়িটা রুখতে হবে।

পটলা বলে,

তার ব্যবস্থা করছি দ্যাখ না।

পটলা অন্ধকারেই কোথা থেকে দুটো ঠ্যালাগাড়ি এনেছে, এমন সময় দেখা যায়, গেটটা খুলে গাড়িটা বের হয়ে আসছে। এরাও তৈরি হয়েছে।

গাড়িটা এগিয়ে বাঁকের মাথায় আসতেই পটলা পরপর দুটো ঠ্যালাগাড়িকে পথের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ড্রাইভার এমন বিপত্তির জন্য তৈরি ছিল না।

গাড়িটাকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করার আগেই একটা ঠ্যালাগাড়ি এসে গাড়িতে লেগেছে, একদিকের হেডলাইট চুরমার হয়ে যায়। ড্রাইভার, ব্রেক কষে গাড়ি থামায়।

পটলা লাফদিয়ে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়।

পিনু-বুলুর হুঁস হয়।

লালু এরমধ্যে পিনুর লম্বা চুলগুলোকে ধরেছে, টেনে নামাতে চায় ওকে গাড়ি থেকে। পিনুকে ধরে ফেলেছে ওরা যুৎ করে।

বুলু চেম্বার বের করে গুলি করতে যাবে, পটলা এদিক থেকে ওর হাতটা ধরে ফেলে মুচড়ে রিভলবারটাই কেড়ে নিয়ে নাকেই ঘুসি মারে।

গর্জাচ্ছে লালু, বের কর ওদের!

গাড়ির দরজায় পিনুর মাথাটা ঠুকছে, ড্রাইভার ওখানকার লোক প্রথমে সে অতর্কিত আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না এখন ধাক্কাটা সামলাচ্ছে—এমন সময় ধাক্কাধাক্কিতে একটা ঠ্যালা গাড়ি পথের ধারে

খাদে নেমে। পাশে যেতে ড্রাইভারও পথ পেয়ে যায়। সেই মুহূর্তে ড্রাইভারও গাড়ি টপ গিয়ারে তুলে চলে যাবার চেষ্টা করে।

লালুরা সেই হিসাবটা করেনি।

ফলে গাড়িটা বের হয়ে যায় একচোখো জানোয়ারের মত। লালু-পটলারা ছিটকে পড়ে।

লালুর হাতে পিনুর একগোছা চুল মাংস সমেত উঠে এসেছে, আর পটলার হাতে বুলুর সেই চেম্বারটা।

ওরা এ যাত্রা বের হয়ে গেল এদের হাত থেকে।

রাতের অন্ধকারেগাড়ির পিছনের আলো দুটো তখনও জ্বলছে। পালাচ্ছে গাড়িটা তীব্রবেগে।

লালু গর্জায়, আজ বেঁচে গেলি, এর জবাব দোবই একদিন।

পটলা বলে, উঃ! ফসকে গেল!

লালু বলে,

এ খবর কোথাও জানাবি না। তবে যদুদার খুনীদের খবর এবার জেনেছি। এর জবাব দিতেই হবে। রাতের অন্ধকারে ক'টি তরুণ আজ একটা কঠিন শপথই নিল। অন্য পথের শপথ।

দেবেনবাবুর ঘুম আসেনি। বিজয়াও মুষড়ে পড়েছে।

দেবেনবাবাবু বলেন,

হিংসা, খুনোখুনির পিছনে আজ এমনি জঘন্য স্বার্থ ফুটে উঠবে তা ভাবিনি বড় বৌ। আর কি জানো, এ রক্তপাতের শেষ এখানেই নয়। মনে হয় এই তার শুরু। কোথায় থামবে তা জানি না।

বিজয়া বলে, লালুকে এইবার সামলাও। ওতো ক্লাব-ইলেকশন নিয়ে মাতামাতি করছে। এখনও ফেরেনি। কি যে করে বাইরে এতরাত অবধি কে জানে!

সাবিত্রীও ঘুমোয়নি।

যতীনের কথা মনে পড়ে। যদুবাবুর শোকসভাতে সেও গিয়েছিল। যতীনের সঙ্গে ফিরছিল।

সাবিত্রীর মনের অতলের সেই ভালবাসার সুরটা কোথায় নিদারুণ আঘাতে যেন আর্তনাদ হয়ে ওঠে। সাবিত্রী স্বপ্ন দেখেছিল ঘর বাঁধবে তারা।

কিন্তু এ এক বিচিত্র ছন্নছাড়ার যুগ। এ যুগে প্রেম-ভালবাসা ঘর বাঁধার কোন দামই নেই।

যতীন বলে, সামনে অনেক কাজ সাবিত্রী, যদুদার এই হত্যা আজ মনে করিয়ে দিল ঘর বাঁধার সময় আজ নয়। সামনে শুধু অন্ধকার আর ঝড়ের সংকেত। এখানে পাশাপাশি পথই চলতে হবে, ঘর বাঁধার অবকাশ আর নেই।

সাবিত্রীর মনে হয় কথাটা কঠিন সত্য।

সারা এলাকায় নেমেছে শোক আর আতঙ্কের স্তব্ধতা। এতদিন এলাকার মানুষ কত রাত্রির অন্ধকারেও নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরেছে।

বাড়ির বৌ-ঝিরা সিনেমা দেখতে গেছে স্টেশন বাজারের লাগোয়া সিনেমা হাউসে। কলরব করে যে যার ঘরে ফিরেছে। দোকানদাররাও দোকান খুলে রাখতো নিশ্চিন্ত মনে।

কিন্তু এবার সারা এলাকার মানুষের মনে ভয়ের ছায়া নামে। কেউ যেন নিরাপদ নয়, এখন।

একটা কালো অশুভ ছায়া যেন এখানের আকাশের আশাকে গ্রাস করেছে।

ওই হত্যার পর সারা এলাকার রূপ বদলে গেছে। দোকানপাট সন্ধ্যার পর থেকেই বন্ধ। বাড়ি-ঘরের আলোও জ্বলে না। মোড়ে মোড়ে দু'চারজন জটলা করছে মাত্র। যেন কোন অসাধারণ ভয়ে ভীত।

যতীন আর সাবিত্রী ফিরছে বাড়ির দিকে।

দেবেনবাবুর শরীর ভাল নেই, তিনি আগেই ফিরে গেছেন। মোড়ের কোন ছেলে বলে, যতীনদা, একা ফিরছেন রাত করবেন না। দিনকাল ভাল নয়।

সেই হত্যাকারীর দল যেন এবার যতীনকেও ছাড়বে না। আজ যতীনই ওই এলাকায় যদুপতিবাবুর মনের মানুষ। সাবিত্রী ভীতচকিত চোখে চাইল ওর দিকে।

সাবিত্রী বলে যতীনকে, তুমি বরং বাড়ি চলে যাও। রাত কর না। আমি যেতে পারব।

হাসে যতীন।

এত ভয় আমার নেই সাবিত্রী। চল—

দুজনে ফিরছে নির্জন পথ দিয়ে।

সাবিত্রী বলে, সাবধানে থেকো। বড় ভয় করে আমার।

যতীন চাইল ওর দিকে। আজ ভালবাসার সব সুর যেন মুছে দিয়েছে নিষ্ঠুর এই যুগ, এখানে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার সংগ্রামটাই বড় হয়ে উঠেছে।

যতীন বলে, প্রেম এ যুগ থেকে সরে গেছে।

সাবিত্রী চাইল ওর দিকে।

এখনও ফুল ফোটে, এখনও কোন রাতজাগা পাখি গান গায়, চাঁদের আবছা আলো পুকুরের জলে ছায়া আঁধার ঘাসের বুকে আলপনা আঁকে। সাবিত্রী আজও ভালবাসে।

বলে সে, তা নয় যতীন। ভালবাসার মৃত্যু নেই, সে বেঁচে থাকবেই। ঘর বাঁধার দিন আসবে কিনা জানিনা। তবু ভালবাসা মানুষের সব ভাঙনের মাঝেও জেগে উঠবে, তার সার্থকতা নাই বা রইল। দেবতার পুজোয় ফুল না লাগলেও বনের ফুল ফোটা থেমে থাকে না যতীন।

যতীন চাইল সাবিত্রীর দিকে। ওর হাতখানা যতীনের হাতে। একটু উত্তপ্ত কবোষ্ণ স্পর্শে তাদের মনে কি সাড়া এনেছে।

যতীন বলে, এমনি কিছুই তোমার কাছে আশা করেছিলাম সাবিত্রী, আশা করি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

ওদের ছায়া ঢাকা বাড়ির কাছে এসে গেছে ওরা। সাবিত্রী বলে, বাড়ি যাবে না?

যতীন বলে, আজ থাক। মাস্টারমশাই খুব ভেঙে পড়েছেন, কাল এসে দেখা করব।

সাবিত্রী চেয়ে থাকে ওর গতিপথের দিকে। আজ সেও আবিষ্কার করেছে যতীনের ভালবাসাকে। কি তার সার্থকতা জানে না সাবিত্রী, তবু মনে মনে আজ কি এক পরম সম্পদের সন্ধান পেয়ে তার শূন্য মন ভরে উঠেছে।

রাত্রি হয়ে গেছে। এখনও লালু ফেরেনি। বিজয়া দু'একবার খবরও নিয়েছে। ভাবনায় পড়ে সে।

কি যে করে বাছা বুঝি না। তুই একটু বুঝিয়ে বল সাবিত্রী ওকে।

মা ভিতরে চলে গেছে।

হঠাৎ বাইরের দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে ঠুক ঠুক! ওই কড়া নাড়ার শব্দটা তার চেনা। সাবিত্রী দরজা খুলে দিতে ঢুকছে লালু। উস্কোখুস্কো চেহারার দিকে চেয়ে শুধোয় সাবিত্রী,

কোথায় ছিলি এত রাত অবধি?

লালু বলে, একটু কাজ ছিল। খিদে লেগেছে, খাবার রেখেছিস দিদি?

সাবিত্রীর ঘরেই ওর খাবার থাকে। লালু হাত মুখ ধুতে গেছে কুয়োতলায়। বিজয়া বের হয়ে আসে। ছেলেকে দেখে শুধোয়, এত রাত করে কোথায় ছিলি? যা দিনকাল পড়েছে— ভয়-ডর নেই তোর?

লালু বলে, যাও, শুয়ে পড়োগে মা।

বিজয়া ছেলেকে দেখে একটু ভাবনামুক্ত হয়ে ফিরে গেল। খাবার বলতে কয়েকখানা রুটি, একটু ডাল, সামান্য ঘ্যাঁট, সঙ্গে একটু গুড়। খিদের চোটে তাই গোগ্রাসে গিলতে থকে লালু।

সাবিত্রী বলে, এত রাত করে ফিরিস না। যা দিনকাল পড়েছে। বাবারও শরীর ভাল নেই। চাকরি করতে আর পারবেন না। কি করে আমাদের চলবে ভাবছিস ?

লালুর মাথায় ওসব ভাবনা ঢোকে না।

বলে সে, তুই ওসব ভাব দিদি। আমি ভাবছি যদুদাকে এভাবে মারল কেন? সেই শয়তানের দল সবকিছু দখল করতে চায়। কিন্তু দেখে নিস ওদের মুখোস একদিন খুলবোই। তারা কারা, সে খবরও জানবে সবাই! তার জন্যেই গেছিলাম রে!

সাবিত্রী চাইল ওর দিকে।

শুধোয় সে, তারা কারা? চুপ করে যায় লালু। জানে এখন কোন কথা প্রকাশ করা ঠিক হবে না।

বলে সে, একদিন বলব তোকে।

সাবিত্রী দেখছে লালুকে। বলে সাবিত্রী, সাবধানে থাকিস লালু।

লালু বলে, জানের ভয় আমি করি না দিদি। বাঁচতে হয় মানুষের মত বাঁচব, না হয় লড়াই করে শেষ হয়ে যাবো। জবাব দিতে পারব যে বাঁচার জন্য লড়েছিলাম। ব্যাস।

এ যেন অন্য এক লালু, সেই কিশোর-কোমল অসহায় ছেলেটি নয়।

জীবনের, সমাজের কাঠিন্য কি নির্মম আঘাতে তাকে বদলে দিয়েছে। সাবিত্রীর মনে হয় আজকের দিন যৌবনের প্রেমকেই ব্যর্থতার অভিশাপ দিয় ক্ষান্ত হয়নি।

তারুণ্যের নিষ্পাপ কোমলতাকেও কি নির্মম আঘাতে বেদনার্ত প্রতিবাদমুখর একটি জ্বালায় রূপান্তরিত করেছে। সবকিছু

হারিয়ে যেতে বসেছে আজ। সব প্রেম ভালবাসার স্বপ্ন আশা।

লালু হাত-মুখ ধুয়ে ওঘরের তক্তপোষে গিয়ে শুয়েছে। সারাদিন কেটেছে কি দুঃসহ ক্লান্তিতে, এখন ঘুমোচ্ছে। সাবিত্রীর চোখে ঘুম নামে না। তার মনে ভাবনার রাশি।

বাবার শরীর ভেঙে পড়েছে। জানে না সাবিত্রী এরপর এ সংসারে কি সর্বনাশ নামবে। বাঁচার লড়াই-এ তাকেও সামিল হতে হবে, সেখানে প্রেমের কোনও স্বপ্ন নেই।

রমেশ আর ইরা সেন তাদের বাড়ি থেকে গাড়িতে করে পিনু, বুলুদের বিদায় করে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। গাড়িটাকে দেখা যায়।

হঠাৎ ওই রাস্তার উপর লালুদের দলকে দেখে চমকে ওঠে রমেশ। ইরাও দেখছে ওদের। তারা ভাবতে পারেনি যে সত্যি লালুর দল এখানের খোঁজ পেয়ে এসে গেছে। এবার ওদের ধরতে পারলে সব খবরই বের করে নেবে তারা।

ইরা বলে, কি হবে রমেশ! ওরা গাড়িটাকে থামিয়ে ওদের নামাবার চেষ্টা করছে।

রমেশও দেখছে দূর থেকে রাস্তার আলোর নীচে ওই ঘটনাটাকে।

কিন্তু কিছু করার আগেই ওই বুলুর দল কোনমতে পালাতে পেয়েছে এদের বিপর্যস্ত করে। ইরা নিশ্চিন্ত হয়।

নাঃ পারেনি ওরা!

রমেশ বলে, আজ পারেনি। তবে খবর ওদের জানতে বাকি নেই। ওদের ধরবেই আজ না হয় কাল। গুরুত্ব বুঝে ইরা ভীতু কণ্ঠে শুধোয় কি হবে রমেশ!

রমেশ ভাবছে কথা।

তার মনে হয় এবার বাকী কাজটা বুলু পিনুর দলই করবে।

সংঘাতটা বাধবে দুই পক্ষের মধ্যে।

রমেশ নিশ্চিন্ত মনে বলে, কি আবার হবে? এবার ওরা নিজেদের মধ্যে লড়ুক, মরুক, বাঁচুক, আমাদের দেখার দরকার নেই।

ইরা সেন নির্মম মানুষটিকে দেখছে। ও যেন এদের মানুষ বলেই মনে করে না। অথচ সর্বহারাদের দুঃখে রমেশ যেন ফেটে পড়ে মঞ্চে।

বুলু, পিনুরা বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে ডানহাতে একটা নোংরা ফেলা রাস্তা ধরে গিয়ে থামল। খালের ধারের এদিক ওদিক ছড়ানো ছিটোনো বাড়িঘর, রাতের অন্ধকারে চারিদিক নীরব।

দু'চারটে কুকুর ওদের দেখে ডেকে ওঠে।

বুলু, পিনুদের মনে তখন ঝড়ের চিহ্ন। কোনমতে এই লালুদের হাত থেকে বেঁচেছে আজ। কিন্তু ধরা যেন পড়ে গেছে। এবার লুকিয়ে থাকতেই হবে। স্টেশনে যাওয়া এখন নিরাপদ নয়। ট্রেনও নেই। ওরা গাড়ি থেকে নেমে গাছের ছায়া অন্ধকার ঘেরা জায়গার ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। ওদের চেনা আশ্রয় ওটা।

পিনু বলে, শালারা সব জেনে ফেলেছে বোধ হয়!

বুলু বলে, দিনকতক চুপচাপ থাক, তারপর একদিন গিয়ে ঝেড়ে দোব লালুটাকে। শালার মস্তানি ছুটিয়ে দেব।

ওদের গলার শব্দে বের হয়ে আসে পতিত।

ইদানীং সে চাল ছাড়াও অন্য অনেক কিছু স্মাগলিং করে, দমদমের কাছে বাড়িঘরও করেছে, আর এই দূর মফঃস্বলেও একটা পাকাবাড়ি বানিয়েছে পতিত, এখানেও তার ডেরা গড়তে হয়েছে। পতিত সব খবরই রাখে। বলে সে, আজ শলা যদুপতিকে নিকেশ করেই এতো, এরপর তো অনেক কাজ বাকী রে!

পিন্‌ বলে, এই তো কলির সন্ধ্যে। আবার ওই এলাকা দখল করতে হবে. ওয়াগন-এর কাজ শুরু করতে হবে। পতিত বলে, দু,চারদিন জিরিয়ে লেগে যা। চল।

ওরা আশ্রয় পেয়ে আবার নতুন করে কাজের কথা ভাবছে। আর লালুদেরও দেখে নেবে তারা।

স্কুলের নির্বাচন নিয়ে নবীনবাবু মামলা করেছিল, আজ দুপুরেই তারা ইনজাংশন পেয়ে গেছে। ওই নতুন কমিটি এখন কাজ করতে পারবে না।

ইরা সেনের বাড়িতেই খবরটা আনে নবীনবাবু, রমেশও এসে জুটেছে। নবীন বলে, দিয়েছি ভোটের দফারফা করে। এখন বোঝ মজা। নবীনকে চিনিসনি। রমেশ আরাও সাবধানী।

বুদ্ধিটা ইরা সেনই দেয়। বলে সে -তাহলে নতুন ইলেকশান না হওয়া অবধি ওই কমিটি থাকলে অসুবিধা হবে, জানান এখুনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসানো হোক ওই ভোট না হওয়া অবধি!

রমেশও কথাটা লুফে নিয়ে বলে. ঠিক কথা। ওদের তবু থামানো যাবে। আর এটাকে রদ করতে পারলে এবার হাসপাতালের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এগোনো যাবে। কয়েকটা লোককে ঠিক করছি।

রমেশ বলে, দেখছি সদাব্রতদাকে ফোন করে। সদাব্রতবাবু তার পূর্বপরিচিত। শিক্ষাবিভাগের কোন মাতব্বর। তাকেই ফোন করছে এবার।

দেবেনবাবু স্কুলেই হঠাৎ কাদের উৎফুল্ল হয়ে চেঁচামেচি করতে শুনে চাইলেন। নীচের মাঠে হরিহরবাবু, বিলাসবাবু, নরেশবাবু আরও বেশকিছু শিক্ষক, কর্মী, মায় ক্লাশ টেনের ধেড়ে ধেড়ে কিছু ছাত্ররা চীৎকার করছে। খুব খুশি হয়েছে তারা।

স্কুলের সামনের মাঠেও জটলা করছে অনেকে। দেবেনবাবুকে

দেখে তারা চুপ করে গেল।

কেমন একটা উত্তেজনার ভাব, দেবেনবাবুকে দেখে শান্তনুবাবু এগিয়ে এসে বলেন খবর শুনেছেন স্যার? এই নতুন স্কুল কমিটির বিরুদ্ধে নালিশ করে নবনীবাবু জিতেছেন। এ কমিটি ইলেকশান নাকি বাতিল করে নতুন ইলেকশান হবে। ততদিন স্কুলে সরকারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটার বসছেন।

দেবেনবাবু অবাক হন, তাই নাকি!

খবরটা শুনে চমকে উঠেছেন তিনি। যদুপতিবাবুর সেই শোকসভায় সেদিন রমেশ বিশ্বাসবাবুরা ঘোষণা করেছিল যে যদুবাবুর গড়া স্কুলের কাজে তারা সহযোগিতা করবে, যদুবাবুর চিতার ছাই মুছে যাবার আগেই তারাই নিজেদের স্বরূপ নিয়ে বের হয়েছে। আদালতে গেছে।

চীৎকার ওঠে, স্কুল নিয়ে ব্যবসাদারী চলবে না। এই কমিটি বাতিল করো!

নরেশবাবু চীৎকার করে, হেডমাস্টারের জমিদারী বাতিল করো—

দেবেনবাবু বিবর্ণমুখে শুনছেন ওই কথাগুলো।

রমেশও এসে পড়েছে রীতিমত শোভাযাত্রা করে। বাজারের কিছু মস্তান, কিছু কৌতূহলী লোক আর লড়াকু জনতা নিয়ে সে এসে সদ্য আসা অ্যাডমিনিস্ট্রেটার ভদ্রলোকের কাছে লিখিত ডেপুটেশনই দেয়। তখনও ওই সব শ্লোগান চলছে, আর সেই চীৎকার যেন ক্রমশঃ বাড়ছে রাস্তার মাঠে।

হেডমাস্টারের দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে!

অ্যাডমিনিস্ট্রেটার ভদ্রলোক এখানে এসে হাওয়া বুঝে নিয়ে অপিসে বসেছেন। বিশ্বাসবাবুরাও এসেছেন। নবাগত অফিসার মিঃ দে চৌধুরী বলেন দেবেনবাবুকে, এর পর থেকে খাতাপত্র

আমাকেই সব দেবেন। আর এর মধ্যে অ্যাকাউন্টসও দেখাবেন আমায়। নতুন বিল্ডিং-এর হিসাবপত্রে নাকি গোলমাল রয়েছে অনেক, সব বুঝিয়ে দেবেন।

দেবেনবাবু চাইলেন ওর দিকে।

তরুণ উদ্ধত অফিসারটি এবার ফস্ করে সিগ্রেট ধরিয়ে দেবেন বাবুর মুখের সামনে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে,

আমার ঘরেই এসে হাজিরাখাতায় সই করতে হবে। শুনি আপনার তো আসা-যাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নেই? ক'টা ক্লাশ নেন সপ্তাহে? না আসলে নেন না কোন ক্লাশ।

দেবেনবাবুর সারা শরীর রাগে জ্বলে ওঠে। ওইটুকু একটা তরুণের এই ঔদ্ধত্য তাঁর মনে ঝড় তুলেছে। এই লোকের তাঁবে চাকরী করতে হবে এটা ভাবতেই পারেন না দেবেনবাবু।

ওর ঘরে ঢুকেছে, একবার বসতেও বলেনি। দেবেনবাবু ইচ্ছা করেই বসেননি। বলেন তিনি,

সকাল ছ'টা থেকে বারোটা আর দুটো থেকে রাত্রি সাতটা পর্যন্ত থাকি। আর ক্লাশ নিই সপ্তাহে ষোলটা থেকে কুড়িটা।

ভদ্রলোক বলেন ওসব কাগজ-কলমে অনেক থাকে। কাল থেকে দেখবো কি করেন।

দেবেনবাবু বলেন।—কাল থেকে আর আসছি না।

ওর স্থিরকণ্ঠে তরুণ অফিসার চাইল, কেন?

দেবেনবাবু মনঃস্থির করে ফেলেছেন। বলেন তিনি,—কাল থেকেই রিজাইন দিচ্ছি চাকরীতে! একে কোন দিনই চাকরী বলে ভাবিনি। নেশার মত স্কুলে ছেলেদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছলাম। যখন জানলাম, আপনার মত লোকের আণ্ডারে চাকরী করতে হবে, তখনই ঠিক করেছি এ আর চাকরী করবো না।

রেজিগনেশন লেটার আজই দিচ্ছি। রেজিগনেশন লেটার চিঠি এর কথা শুনে তরুণ ভদ্রলোক কঠিন স্বরে বলে,

এত টাকার হিসাব বাকী, আপনি চলে গেলেও আমি যেতে দিতে পারি না।

দেবেনবাবু বলেন কঠিন স্বরে,

আপনার গোলাম নই। খাতাপত্র সবই আছে, চ্যাটার্ড অ্যাকাউণ্টেটের সইকরা অডিটেড হিসাবই আছে। দেখে নেবেন। অসুবিধা হয় আমার বাড়িতে লোক পাঠাবেন বুঝিয়ে দেব।

দেবেনবাবু নিজের ঘরে এসে বসেন। আজ তার চাকরীর শেষ দিন। নিজের হাতেই তিনি এই যবনিকা পাত ঘটাতে চান।

মনে পড়ে তিরিশ বছর আগেকার কথা।

সেদিন মাঠের চিহ্ন ছিল না। ছিল বাঁশবন, জলা—ঝোপ।

একপাশে ভাঙ্গা টালির একটা ঘর, আর কিছু ছাত্র।

সেই ছায়াঘন বন কেটে আজ তিনি দীর্ঘ তিরিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন এই বিশাল প্রতিষ্ঠান। হাজার হাজার ছেলে এখান থেকে বের হয়ে আজ দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ কিছু কৃতি ছাত্রও তৈরি করেছিলেন।

আজ যদুবাবুও নেই।

তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে সমাজবিরোধীদের বোমার আঘাতে। তাদেরই আঘাতে আজ দেবেনবাবুর দীর্ঘ তিরিশ বছরের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল, তাদের আঘাতে আজ মান-সম্মানও বিপন্ন।

দেবেনবাবু চিঠিটা শেষ করে পাঠিয়ে দিলেন অফিসে, তাঁর পদত্যাগপত্র।

খবরটা স্কুলে, মায় বাইরেও এর মধ্যে হাওয়ায় ছড়িয়ে গেছে। দেবেনবাবু পদত্যাগ করছেন।

এদিকে টিচার্সরুমের ভিতরে তখন ঝড় উঠেছে।

বহু শিক্ষকই এটা চাননা।

এদিকের কোণে বিলাসবাবু খুব খুশি। এবার তাঁকেই

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চার্জ বুঝে নিতে বলেছেন। খুশি হয় নরেশ, নৃপতি, হরিহর বাবুরাও।

দেবেনবাবু ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকতে দেখেন বিলাসবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর তরুণ ভদ্রলোক। তিনি বলেন দেবেন-বাবুকে—একে চার্জ বুঝিয়ে দিন।

দেবেনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন, বিলাস লোভী একটা জানোয়ারের একটুকরো মাংসের দিকে ধেয়ে যাবার ভঙ্গীতে গিয়ে শূন্য চেয়ারে বসে সেটাকে যেন দখল করে নেয়।

দেবেনবাবু ধীরে ধীরে অফিসঘর থেকে বাইরের হলঘরে আসেন, হলঘর তখন ছাত্র, শিক্ষকদের ভিড়ে ভরা। তিনি এগিয়ে যান বাইরের দিকে।

দেবেনবাবু এককথায় ছত্রিশ বছরের পরিশ্রমে গড়া ওই স্কুল তার অতীতকে পিছনে ফেলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আজ যদুবাবুর কথা মনে পড়ে।

তিনি বলেছিলেন, স্কুল থেকে যেতে হয় আমি গেলে যেও, আজ দেবেনবাবু তাঁর কথা রেখেছেন।

স্কুলের মাঠে এসে হাজির হয়েছে ছাত্র, বেশকিছু অভিভাবকও। তারা নরেশদের চক্রান্তের খবর পেয়ে চমকে উঠেছে।

পটলা-গোবিন্দের দলও এসে গেছে।

চীৎকার-চেঁচামেচি চলেছে।

দুই পক্ষই যুদ্ধমান। স্কুল যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে।

দেবেনবাবু জীর্ণ কণ্ঠে বলেন, এখান থেকে তোমরা যাও। স্কুলের পবিত্রতা নষ্ট করো না। আমি স্বেচ্ছায় এখান থেকে চলে যাচ্ছি! কোন গোলমাল করো না।

দেবেনবাবু কোনমতে বের হয়ে একটা রিক্সায় উঠে চলেছেন।

আজ চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। এভাবে চক্রান্ত করে

তাঁকে সরে যেতে বাধ্য করা হবে তা ভাবেননি। অপমানে, কি বেদনায় তাঁর দু-চোখে জল নামে।

পিছনে চিৎকার, কলরব উঠছে স্কুলের মাঠে।

রমেশ বেগতিক দেখে পুলিশে ফোন করেছিল। দু-লরি পুলিশ এসে ঢোকে স্কুলে। জনতা পুলিশ দেখে আরো জোরে চীৎকার করতে থাকে, তার পরই পুলিশ লাঠি চালাতে শুরু করে বেপরোয়াভাবে।

বাচ্চা ছোট ছেলের দল ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে, ভিড়ের চাপে কেউ আহত হয়, কারো মাথায় ঘাড়ে পিঠে পড়েছে লাঠি, রক্ত ঝরছে। কলরব আর্তনাদে পরিণত হয়।

ছুটে আসেন দেবেনবাবু, রিক্সা থেকে নেমে এই মার মুখী জনতা—পুলিশের মাঝখানে ঢুকে পড়েন তিনি। চীৎকার করেন। থামো। থামো তোমরা।

কিন্তু পুলিশ তখন মারমুখী। পিটছে ছাত্রদের। কেউ ছিটকে পড়েছে। দেবেনবাবু ছুটে যান তিনি ওই ঝড়ের মধ্যে।

একটা ছেলেকে উদ্যত লাঠি থেকে বাঁচাতে গিয়ে লাঠিটা দেবেনবাবুর মাথাতেই পড়ে।

ছিটকে পড়েন তিনি কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে। চশমাটা ছিটকে পড়েছে। আজ তাঁর তিরিশ বছরের শিক্ষকতা, স্কুলের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমের মূল্য দিয়ে যান তিনি নিজের রক্ত দিয়ে।

শেষ অবধি লড়াই থামে। তখনও স্কুলের মাঠে ছড়িয়ে রয়েছে ছেলেদের বই-খাতা-জুতো, এখানে ওখানে লেগে আছে রক্তের দাগ!

আহত দেবেনবাবুকে বাড়িতে নিয়ে গেছে যতীনবাবু আরও কজন।

বিজয়া চমকে ওঠে, একি সর্বনাশ করে এলে? তুমি কেন গেলে ওখানে?

দেবেনবাবু বলেন।

কেঁদো না বড়বৌ, এতদিন ওই ছেলেদের মধ্যে কাটিয়েছি, ওদের উপর অকারণে লাঠি চলবে এটা দেখতে পারিনি। তাই বাঁচাতে গেছিলাম।

যতীন ডাক্তার এনেছে। বাড়ির আশেপাশে ভিড় কমে এসেছে। শহরে সাড়া পড়ে গেছে। লোকের মুখে মুখে আলোচনা চলে, দিনকাল এত তাড়াতাড়ি বদলে যাবে কেউ তা ভাবেনি।

দেবেনবাবুর বাড়িতে স্তব্ধতা নেমেছে। লালু দলবল নিয়ে বাইরে শিল্ড ফাইন্যাল ম্যাচ খেলতে গেছিল। আসানসোলের খেলায় ওর টিম জিতেছে। বিরাট শীল্ড, বেস্টম্যান কাপ নিয়ে ফিরছে তারা।

স্টেশনে নেমে শোভাযাত্রা করে আসার কথা। ক্লাবের অন্য অনেকেই এসেছে। বাইরে থমথমে ব্যাপার। স্কুল ও বন্ধ হয়ে আসে। দেওয়ালে পড়েছে নানা ধরনের পোস্টার। নকশালদের পোস্টার-এ ছেয়ে গেছে চারিদিক। বন্দুকের নলই শক্তির উৎস! আরও নানা লেখা রয়েছে। সকলের মুখে চোখে সন্ত্রস্ত ভাব। আবহাওয়া কেমন বদলে গেছে।

মিণ্টু বলে, শীগগীর বাড়ি যা লালু।

লালু ওর কথায় একটু অবাক হয়ে শুধোয়, কেন রে?

কি হয়েছে?

মিণ্টু বলে, না, তেমন কিছু হয়নি। স্কুলে কি সব গোলমাল হয়েছিল, হেড-স্যার চোট পেয়েছেন।

সেকি! লালু চমকে ওঠে। বাড়ির দিকে দৌড়ায় সে। দেবেন বাবু একটু সুস্থ আছেন।

আঘাতটা দেহে যত না বেশি লেগেছে তার চেয়ে অনেক বেশি লেগেছে মনে। যেখানে ওই স্বার্থের সংঘাত আজ সেখানে যেতে

মন চায় না।

দেবেনবাবু লালুকে দেখে চাইলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে লালু বাড়ি ঢুকেছে তার মুখে কি আতঙ্কের ছায়া, লালু দেখছে বাবাকে। সেই সৌম্য শান্ত মানুষটার চেহারা যেন বদলে গেছে। আজ একদিনে ওঁর বয়স বেড়ে গেছে।

মাথায় কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

লালুর মনে হয় যারা যদুবাবুকে খুন করিয়েছে তারাই কৌশলে স্কুলে গোলমাল বাধিয়ে তার বাবাকেও শেষ করতে চেয়েছিল।

লালুর মনে পড়ে সেই রাতের কথা।

পিনু, বুলুদের আটকাতে না পারলেও চিনতে পেরেছিল তারা, আর লালু জেনেছে ওদের পেছনে কে বা কারা আছে। ইরা সেন, রমেশ সরকাররাই এই সর্বনাশের মূলে! তাদের দেখে নেবে এবার লালু!

বিজয়া বলে,

এবার বাড়ি-ঘর সামলা লালু, সামনে পরীক্ষাটা মন দিয়ে দে। বাবার তো এই হাল! শুনেছিস বোধ হয় তোর বাবা স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

তাই নাকি! লালু এতটা কাণ্ড হবে ভাবতে পারেনি। আজ সংসারেও নেমেছে অভাব আর বিপর্যয়ের ছায়া। লালুর মনে হয় ওই অন্ধকারের জীবগুলো তাদের মত মানুষদের সবকিছু কেড়ে নিতে চায়। একা তাদের সংসারেই নয়, এমনি কালো ছায়া নেমেছে সর্বত্র, সমাজের কোণে কোণে।

অসহায় রাগে লালু বের হয়ে এলো। চুপচাপ বসে আছে সে বাইরের বাড়িতে।

এককালে এইখানে ছিল বহু লোকজনের আনাগোনা। ছেলেরা

পড়তে আসত। ওদিকে ছায়াঘন আম-কাঁঠাল-পেয়ারার গাছ। বাতাবিলেবুর গাছটায় ফুল আসে এখনও, আজও মিষ্টি সুবাস ওঠে। কিন্তু লালুর স্মৃতিকে আজ ওইসব কিছু পীড়িত করে তুলেছে মাত্র।

সাবিত্রী শেষ অবধি এসেছে ইরা সেনের স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে।

চিঠিটা হিরণদির মারফৎ পেঁৗছেছিল, কিন্তু সাবিত্রী মা বাবাকেও বলেনি। নিজে ভেবেছিল কথাটা। কিন্তু বাবার আহত হবার পর সব ব্যাপার শুনে সাবিত্রী আজ নিজেই এগিয়ে এসেছে! ওই অপমানজনক পরিবেশে বাবাকে আর ওই স্কুলে যেতে দিতে চায় না সে। নিজে হয়তো গার্লস সেকশানে চাকরি পেতে চেষ্টা করলে···কিন্তু যেতে আর ইচ্ছা হয়নি। নতুন কমিটি ভেঙে গিয়ে সেখানে এসেছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার।

সাবিত্রী তাই পথ না পেয়েই গেছে ইরা সেনের স্কুলে চাকরীর সন্ধানে।

ইরা সেন জানতো সাবিত্রীকে তার এখানেই আসতে হবে।

তাই ওর শ্লিপ পেতে ইরা সেন ইচ্ছা করেই ওকে বসিয়ে রাখে। সাবিত্রী এর আগে স্কুলের ভিতর আসেনি। সামনে একটা ঘাট বাঁধানো পুকুর, ওদিকে আম-কাঁঠাল-লিচু গাছের ছায়াঘন পরিবেশ। সুরকি ঢালা রাস্তার একদিকে ফুলের বাগান। পরিবেশটা শান্ত। স্কুলবাড়ির ওপাশে ইরা সেনের নিজের বাড়িটা বেশ ছিমছাম, সুন্দর সাজানো।

আয়া এসে বলে, দিদিমণি ভেতরে যেতে বল্লেন।

ইরা সেন এখন সুন্দরী সেজেই আছে। প্রাচুর্য আর নিশ্চিন্ততা মানুষের মুখে চোখে একটা শান্ত শ্রী আনে। ইরা সেনের মুখে চোখে তারই ছাপ।

ইরা দেখছে সাবিত্রীকে।

ফর্সা ছিপছিপে চেহারা, দুর্ভাবনার ছায় পড়েছে মুখে, তবু একটা আলগা শ্রী আছে সাবিত্রীর যা সহজেই চোখে পড়ে। ইরার মনে হয় রমেশের পছন্দ আছে।

ইরারও কাজে লাগবে সাবিত্রীকে স্কুলে সে সুন্দরী মেয়েদেরই চাকরী দিয়ে রাখে। উপর তলার অনেক মাতব্বরদের তাকে হাতে রাখতে হয়। তার জন্য নানা ভেটও দিতে হয়।

ইরা সেন বলে, বসো।

সাবিত্রী বসলো ইতস্তত করে।

ইরা সেন বলে, তোমার কাগজপত্র দেখেছি। যদি ভাল লাগে এখানের পরিবেশ তাহলে কাজ করতে পারো। আর মাইনে ধরো সাতশো টাকা মত হবে এখন। পরে বাড়বে।

সাতশো টাকা!

সাবিত্রী একটু অবাকই হয়েছে। বাইরে এতটাকা সে পাবে না। এখন তাদের সংসারে এ টাকাটার খুবই প্রয়োজন। বাবাকে সে কিছুটা নিশ্চিন্ত করতে পারবে।

সাবিত্রী বলে, ঠিক আছে।

ইরা সেন জানতো টোপ ও-গিলবেই।

তাই বলে, তাহলে কাল থেকেই জয়েন করো। বেলা ন'টায় কিন্তু আমাদের ক্লাশ শুরু হয়।

সাবিত্রী খুশি মনে বাড়ি ফিরছে। বাবাকে কিছুটা নিশ্চিন্ত করতে পারবে। স্কুলে সাড়ে সাতশো আর বাইরে দুটো টিউশানিতে আড়াইশো টাকা পাবে, তবু চলে যাবে কোন মতে। লালু এবার ফাইন্যাল বি. এ দেবে। পাশ করে সেও পাশে দাঁড়াবে।

বাড়ি ঢুকেই লালুকে দেখে চাইল। শুধোয় সাবিত্রী, কখন ফিরলি?

লালু দেখছে দিদিকে।

বলে সে, একটু আগে। হ্যাঁরে, বাবাকে নাকি ওরা মারতে চেয়েছিল!

সাবিত্রী বলে,

ঠিক জানি না। তবে ছেলেদের বাঁচাতে গিয়ে উনি লাঠি খেয়েছেন। বুঝলি স্কুলে আর বাবাকে যেতে দিতে চাই না। যেভাবে হোক আমি ক'টা মাস চালিয়ে নোব। তুই এবার ওসব ছেড়ে ভাল ভাবে পরীক্ষাটা দে, পাশ করে একটা চাকরী-টাকরী দ্যাখ।

লালু ভাবছে কথাটা। নতুন ভাবনায় পড়েছে সে।

সাবিত্র বলে, কাল থেকে ইরাদির স্কুলে চাকরী নিচ্ছি। আজ সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।

লালু কথাটা প্রথম যেন বিশ্বাস করতে পারে না। ভাবতেই পারে না সে সত্যি কি সেখানে যাবে চাকরীর জন্য।

তাই বলে কাল—কোথায় চাকরী করলি? সাবিত্রী খুশী ভরা স্বরে বলে ইরা সেনের। স্কুলে এবার চমকে উঠল লালু।

দিদিকে আজ সব কথা খুলে বলতে পারে না। ওই ইরা সেনের প্রকৃত পরিচয় সাবিত্রী জানে না, জেনেছে লালু কিছুটা। আজ ওখানেই সাবিত্রীর চাকরীর কথায় অবাক হয়েছে সে।

লালু বলে, ইরা সেনের ইস্কুলে কাজ নিবি. তুই!

—কেন? ভাল মাইনে দিচ্ছে ওরা – বলে সাবিত্রী।

মাইনে, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য রসদ সংগ্রহ করতে ওদের দরজাতেই যেতে হবে। ওরা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মত দানাপানি কিছু দিয়ে মনুষ্যত্ব, বিবেক সব কিছুকে ফাউ হিসেবে কিনে নিবে।

লালু সাবিত্রীকে সব কথা বলতে পারে না। তার রাগ হয় ইরা সেনের উপরই। বিশেষ কোন মতলব নিয়েই সে সাবিত্রীকে চাকরী দিয়েছে, আর অসহায় লালুকে সেই অন্নদাস হয়ে থাকতে

হবে এইসব মেনে নিয়ে।

যতীন-ভূদেবরা আজ সারা এলাকার মানুষদের জানাতে চায় ওই লোভী মানুষগুলোর স্বরূপের কথা।

রমেশও জানে যে ওরা তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু থামবে না। স্কুলের অধিকার তাকে কায়েম করতেই হবে। রমেশ সেই প্রতি আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে। রাত্রি নেমেছে। ইরা সেনের বাড়ির একটা ঘরে ওদের শলাপরামর্শ চলছে।

নবীনবাবু বলে, তা রমেশ দেবেনবাবুকেও হঠাবার কল ভালই করেছো।

বসন্তবাবু কনট্রাক্টার। রেলের বড় কাজ পেয়েছে। গোপনে রড-লোহা-সিমেণ্ট পাচার করে। ইদানীং সন্ধ্যার পর থেকেই ভয়ে ভয়ে লোকজন পথে সামান্য চলাচল করে। কোথায় বোমা গুলি চলছে। দেওয়ালে পড়েছে নকশালদের পোস্টারও। সারা এলাকা ত্রস্ত।

বসন্তবাবু বলে, রমেশ বুদ্ধিটা ভালই বাতলেছ। লাগাও দু-নম্বরী পোস্টার। কিন্তু যদি আসল নকশালরা কোনদিন আসে তারা ছাড়বে?

আগরওয়ালা বলে, তার আগেই ওই লোকজনের ভয় পেয়ে যাওয়ার সুযোগে ফাঁকা মাঠ থেকে লোহা সিমেন্ট যা পাচার করছো তাও কম নয়। তোমারই তো লাভ।

হাসছে বসন্ত। কথাটা মিথ্যা নয়!

নবীনবাবুর এখন ওয়াগন ব্রেকিং ব্যবসা মন্দা। মালপত্র আসছে না। এই সুযোগে যাতে কাজ শুরু করা যায় তার চেষ্টা করছেন।

পতিত আশা দিয়েছে। ওরা তাই সারা এলাকায় ভয়ের পরিবেশটা বজায় রাখতে চায়। যাতে ওয়াগন ব্রেকিং চালু হয়ে যায়।

রমেশ বলে, এবার কর্পোরেশন, অ্যাসেমব্লী ইলেকশনও জিততে হবে।

ওরা তাই চায়।

—বসন্তবাবু, নবীনবাবুও মদত দেবে রমেশকে, ইরাও রাজী। এখন পিনু, বুলুদের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেছে স্কুলের কেস নিয়ে। যদুবাবুর কথা লোক ভুলে যাচ্ছে।

আর রমেশ চায় এবার প্রতিপক্ষ যতীন, লালুদের দলকে ঠাণ্ডা করতে। ইরা সেনকে কর্পোরেশনে দাঁড় করাবে রমেশ। ওরা তাই কৌশলে এগোতে চায়।

রাত্রি নামছে। নবীন, আগরওয়াল, বসন্তবাবুরা ফিরে গেছে। ইরা সেন আর রমেশ বসেছে দিনের গ্লানি মুছে ফেলতে ঈষৎ কণিয়াক্ আর হুইস্কি নিয়ে।

দুজনে আজ ধাপে ধাপে উঠতে চায়।

রমেশ বলে, ইরা, তুমি হবে কর্পোরেশনের এই এলাকার প্রথম মেয়ে কাউন্সিলার।

তারপর এম-এল-এর সিটটা আগলে থাকব আমি, পরের ইলেকশানে তুমিই যাবে সেখানে।

ইরা সেন স্বপ্ন দেখেছে। মন্ত্রী হবার স্বপ্ন!

সত্যি! ইরা গদ গদ কণ্ঠে শুধায়।

ওকে কাছে টেনে নেয় রমেশ। ধাপে ধাপে তাকে উপরে উঠতে হবে।

যদুপতিবাবুকে সরিয়ে সে স্কুল দখল করেছে। এরপর দখল করবে কর্পোরেশান, তারপর মন্ত্রীত্ব। পথে হারিয়ে যাওয়া নিঃস্ব ছেলেটির কাঙাল মনে আজ অনেক পাবার নেশা।

ইরা বলে, সাবিত্রীকে চাকরী দিয়েছি তোমার কথায়!

রমেশ বলল, ওর ওই জেদ আর তুচ্ছ আত্মসম্মানটাকে মাটিতে

মিশিয়ে দেব ইরা। ওর সতীপনা ঘুচিয়ে দেব।

ইরা কৌতুকভরে বলে, সেকি! তবে যে বলছিলে ওকে ভালবাস।

হঠাৎ হেসে ওঠে রমেশ। নিষ্ঠুর, নির্মম সেই হাসি। হাসির ধমকে ওর মনের অতলের শ্বাপদ নিষ্ঠুরতা যেন ফেটে পড়ে।

ইরা দেখছে ওই অমানুষটাকে। রমেশ বলে, ভালবাসা! রমেশের মনে ওসব দুর্বলতার কোন ঠাঁই নেই ইরা। ওদের উঁচু মাথাটাকে পায়ের নীচে এনে ফেলতে চাই! সবকিছুর দখল পেতে চাই! তাই এসব করতেই হবে। তার মধ্যে ভালবাসা, প্রেম, ন্যায় নীতি এসবের ঠাঁই নেই।

ইরা দেখছে নতুন একটা জীবকে। ওর নির্মমতায় সেও যেন ভয় পেয়েছে।

স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে কয়েকটা বোমা ফাটে, অন্ধকারে পাইপগানের কর্কশ শব্দ ওঠে। সারা এলাকার মানুষ চমকে ওঠে। রেললাইনের মালগাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে, ছায়া-মূর্তির দল আজ আবার হানা দিয়েছে। মালপত্র নামছে—

মহল্লার কিছু ছেলেরাও বের হয়েছে। এতদিন ওরা শান্তিতে ছিল। সেই দস্যুর দলকে ওরা তাড়িয়েছিল। আজ তারা তৈরি হয়ে এসেছে। পিনু, বুলুর দল এতদিন বাইরে গোপন আস্তানায় ছিল। সেখানে তারা গোপনে শক্তি সঞ্চয় করেছে। আর এদিকের আবহাওয়া বদলাতে তারা আবার এসেছে নতুন শক্তি নিয়ে নিজেদের এলাকা দখল করতে।

রমেশ, নবীনবাবু, ইরা সেনের দরকার তাদের, তাই ওরা আবার এসে হাজির হয়েছে।

এখন সময়-সুযোগ এসেছে। এসে আজ হানা দিয়েছে। পিনু-বুলুর দল।

সারা পাড়ায় খবরটা রটে যায়। বুলু-পিনুর দল সেদিন যারা পুলিশে খবর দিয়েছিল সেইসব বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ছে, কাদের আর্তনাদ ওঠে। গর্জাচ্ছে বুলু, মেরে ফেল। উড়িয়ে দে শালাদের।

ওরা যদুবুড়োকে শেষ করেছে, ওদের দলকে ও শেষ করব।

লালুর ঘুম আসেনি। বোমার শব্দে সারা পাড়া কেঁপে ওঠে। রাতের ঘুম ভেঙে গেছে ওদের। সারা পাড়ায় আর্তনাদ কলরব ওঠে।

দেবেনবাবুর ঘুম ভেঙে গেছে। মুখে চেখে আতঙ্কের ছায়া।

সাবিত্রীও ভয়ে শিউরে উঠেছে। কাছেই একটা বোম ফাটল। বাড়ি কেঁপে ওঠে। লালু লাফ দিয়ে উঠেছে।

বাইরে পটলা ডাকছে, লালু!

লালু যেন ওদের অপেক্ষাতেই ছিল।

সেও বের হয়ে যায়, বারবাড়ির ভাঙা চালার ওদিকে কি মালপত্র বের করে দৌড়ল গোবিন্দ, আরও ক'জন ওই অন্ধকারে।

বিজয়া চীৎকার করে, যাসনে! যাসনে লালু!

লালুরাও বের হয়ে এসেছে। সারা গলি—ওদিকের পথের আলো নেভানো। ছায়ামূর্তির দল দৌড়চ্ছে। লালু-পটলা ওদিকে মহড়া নিয়েছে। পটলা ওদের লক্ষ্য করে পর পর দু'-তিনটে বোম ছুঁড়েছে। প্রচণ্ড শব্দে ফেটেঝে সেগুলো।

বুলু, পিনুর দল ভাবেনি যে এত শীঘ্রই প্রতিরোধ শুরু করবে তারা। ওদের খবর লালু, গোবিন্দ পাড়ায় নেই। তাই এসেছিল ওরা রাতের অন্ধকারে।

অন্ধকারে একটা পাইপগানের গুলি এসে লেগেছে পিনুর হাতে। রক্ত ঝরছে। বুলুও ঘাবড়ে গেছে।

লালুরা এগলি-সেগলি দিয়ে এগিয়ে আসছে। বাতাসে ওঠে

বারুদের উৎকট গন্ধ। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে ওদের। বুলু, পিনুর দলকে ওরা ঘিরে ফেলেছে।

বোমার শব্দ উঠছে। অন্ধকারে ছুটছে গুলির আভা। বুলুদের দলের দু'একজন ছিটকে পড়ে।

কোন রকমে ওরা বের হয়ে রেললাইন ধরে অন্ধকারে তাড়া খেয়ে ছুটছে। হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে। উঠে আবার দৌড়াচ্ছে।

পাড়ার লোকজন বের হয়ে আসে এবার। রাস্তায় পড়ে আছে দু'একজন অচেনা ছেলে আহত হয়েছে তারা।

যতীনবাবু, ভূদেববাবুও এসেছেন। এসেছে পুলিশের ভ্যানও।

রমেশবাবুও এসে পড়ে। বলে অনেকেই, একি কাণ্ড শুরু হল।

রমেশ ব্যাপারটায় খুশি হয়নি। পিনু বুলুদের এরা ধরিয়ে দিয়েছে। রমেশ জানে কখন কি করতে হয়। সে ওই জনতার হয়েই এখন চড়া স্বরে কথা বলার চেষ্টা করে।

রমেশ বলে পাড়ায় ঘরে বোমাবাজী করে এলাকা দখল করার চেষ্টা চলছে। এসব নতুন রাজনীতির মারমুখী খেলা। একে থামাতেই হবে, তাই বলে ভণ্ডামী —

পুলিশ অফিসারও শুনেছে কথাগুলো।

যতীন বলে, পাড়ার উপর হামলা হবে, প্রতিরোধ করেছে ওরা। ভণ্ডামী এরা করেনি, প্রতিরোধ করেছে!

রমেশ বলে, তার জন্য পুলিশ আছে, নিজেরাই বোমা, পিস্তল নিয়ে নামবে? এসব আসে কোত্থেকে? এরা কারা?

আহতদের হাসপাতালে পাঠিয়ে পুলিশ দু-একজনের জবানবন্দী নিয়ে যায় মাত্র।

রমেশ যেন পথ পেয়েছে। এর মধ্যে পতিত স্মাগলার এসেছে

খবর নিয়ে। নবীনবাবুর গুদামেও আজ রাতে প্রচুর মাল গেছে।

ওয়াগন ব্রেকিংয়ের কাজ করার পর এই গোলমালটা না করলেই পারতো বুলুরা।

কিন্তু রমেশ বসে নেই। দেখা যায় চারিদিকের দেওয়ালে রকমারি পোস্টার পড়েছে। কোন দল নাকি বন্দুকের নল দিয়েই সমাজের রূপ বদলাতে চায়, তারই সূচনা শুরু হয়েছে মাত্র। রমেশরাও এর প্রতিবাদ করে।

বুলুরা এসেছে ইরা সেনের বাগানে। রমেশ এর মধ্যে এলাকায় যতীন ভূদেববাবুদের নকশাল সমর্থক বলে কিছুটা প্রচার করতে পেরেছে। কৌশলে এবার রমেশ ওদের দলকে বিপদে ফেলতে চায়, মুছে দিতে চায়।

ইরা সেন বলে, ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দেশের মাতব্বরদের দু-চারজনকে বলেছি।

রমেশ বলে,—দ্যাখো যদি কিছু করা যায়! না হলে বুলুদের দিয়ে হবে না। পিনুটা গুলি খেয়েছে. ওই লালু পটলার দলকে সিধে করতেই হবে।

যতীন দেবেনবাবুর কাছে এসেছে খবরটা নিয়ে। যতীন ভূদেবরাও কোর্টে মামলা করেছে, ইনজাংশনও পেয়েছে। যতীন বলে,

স্কুলে ওই ভূতের উপদ্রব হতে দেব না। কোর্ট অর্ডার দিয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিয়োগ অবৈধ। আগেকার কমিটিই কাজ দেখবে। আপনাকে স্কুলে যেতে হবে।

দেবেনবাবু বলেন, স্কুল নিয়ে মামলা! এসব কি করছ তোমরা যতীন। শেষ বয়সে ওসব গোলমালে আর যাব না। ওসব ভালো লাগছে না।

তবু যেতে হয় তাকে তাদের চাপে।

রমেশ, নবীনবাবুরা একটা বাধা পেয়ে এবার যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে। স্কুলে তাদের অত্যাচার বন্ধ করেছে ওরা ওদিকে রেল-লাইনে আবার কড়া পাহারা বসেছে। তাই বুলুর দলকে দিয়ে এবার আর একবার আঘাত হানার চেষ্টা করছে রমেশের দল। যতীনরা রমেশের সব চালই ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাদের অস্তিত্বকে মুছে দিতে যায় যতীন—কালুরা। এ হতে দেবেনা রমেশ। এদের বাঁচার পথ বের করতেই হবে, ভাবছে রমেশ।

নবীনবাবুর কারবার বন্ধ।.

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যার পরই বাজারে কারা হামলা করে।

ভুষণ সাহার দোকানে ঢুকে মুখোসপরা একদল ছেলে রিভলবার দেখিয়ে সারাদিনের বিক্রীর বেশ কয়েক হাজার টাকা নিয়েছে।

মা দুর্গা, জুয়েলারী স্টোর্সে হানা দিয়ে বেশ কিছু সোনাদানা নিয়েছে, গোপাল স্টোর্স চালু লোহার দোকান, ওখানেও হানা দিয়েছে তারা।

কাজ সেরেছে চকিতের মধ্যে।

বেশ কিছু টাকা নিয়ে ওই ছেলের দল দু-চারটে বোমা ফেলে বিদ্রোহাত্মক শ্লোগান দিতে দিতে গাড়িতে করে পালিয়ে যায়। কিছু কিছু ইস্তাহারও ছড়িয়ে গেছে। যেন ওদের এই ডাকাতি-গুলো দেশের নিপীড়িত জনগণকে উদ্ধার করার জন্যই করছে তারা।

সারা অঞ্চলে হৈ চৈ পড়ে যায়।

কর্মব্যস্ত বাজার এলাকায় এই ধরনের ডাকাতি, এত টাকা সোনাদানা লুঠ হবার ঘটনা এই প্রথম ঘটলো। শিউরে উঠেছে মানুষজন। ভিড় জমে যায় পথে ঘাটে।

পুলিশও এসে পড়ে।

যতীনবাবুরা, লালু পটলার দলও এসে পড়ে। এসেছে রমেশ সরকারও।

ম্যাগলার পতিত এখন বাজারে লোক-দেখানি দোকান দিয়েছে। ওটা ওর খবরাখবর সাপ্লাইয়ের ঘাঁটি।

বাজারের দোকানদার মহল এবার পুলিশ অফিসারদের ঘিরে অনুযোগ করে।

যেভাবে হোক ঐ ডাকাতদের ধরতেই হবে। আমাদের এতবড় সর্বনাশ হবে আপনারা থাকতে? এর কোন প্রতিকার হবে না স্যার।

ও. সি-ও ভাবছেন কথাটা।

রমেশ এবার অনুযোগ করে, বাজার শান্তি কমিটি, আপনাদের দারোয়ান, নাইটগার্ড থাকতে এতবড় ডাকাতি হয়ে গেল তিন-চরটে দোকানে তাজ্জব ব্যাপর! কই আগে তো হয়নি।

যতীন বলে, কারা করেছে তাদের খবর মিলবেই। এতদিন কিছু হয়নি। ক'দিন আগে ওয়াগন লুঠ শুরু হল, পাড়ার উপর হামলা হল, বাজারে আবার তারাই হামলা করেছে নিশ্চয়।

নবীনবাবু বলে পুলিশকে,

কারা করে দেখুন স্যার। ইস্তাহারও ছাড়িয়ে গেছে। এবার নাকি তারা আমাদের গলা কাটবে স্যার! ওই গলাকাটা দলেরই কাজ স্যার!

পুলিশ অফিসার এদিক ওদিক ঘুরে কিছু খবর সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ইস্তাহারগুলোও কিছু সংগ্রহ করেন।

সারা এলাকার মানুষের মনে এসেছে আতঙ্ক, লুঠ, খুনও হচ্ছে। গুলিগোলাও চলছে যখন তখন। কাগজেও দেখা যায় সারা দেশে যেন একটা বিচিত্র আলোড়ন শুরু হয়েছে। কারা এতদিন পর প্রচলিত রীতি-নীতিকে আর মানতে চাইছে না। তারা বিপ্লবের সূচনা করতে চায়, রক্তাক্ত বিপ্লব, তারাই বোধ হয় এখানেও এসেছে।

ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে সবাই।

এখানে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশও আর নেই। এ যেন স্তব্ধ এক আতঙ্কের যুগ। যদুবাবুর নিষ্ঠুর মৃত্যুটা এদের মনে একটা হতাশার ছায়া এনেছে।

বুলু, পিনুর দলও খুশী।

আজকের অপারেশান যে এমন নিখুঁত হবে তা ভাবতে পারেনি।

ইরা সেনের বাগানের পিছনের ঘরে রমেশও রয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা প্রায় লাখখানেক টাকার মাল টেনেছে বাজারে লুট করে।

বুলু বলে, এতদিন পর একটা কাজের কাজ হয়েছে রমেশদা। এবার বল যতীন আর লালুদের দিই চেম্বার দিয়ে উড়িয়ে। সবাই জানবে অন্য পার্টির কথা।

রমেশ অবশ্য কাজ পাকা করেছে। বাকীটা করেছে ইরা সেন। উপর মহলে আজকের সন্ধ্যার লুটতরাজের ঘটনার খবর পেঁৗছে গেছে। এরপর কাজ শুরু হবে।

রমেশ বলে, এখন ক'টা দিন সরে গিয়ে চুপচাপ থাকগে। তারপর খবর পেলেই আসবি। ওই বাজার এলাকার অধিকার তোরাই পাবি। আমিই করে দেব।

মাইরী। হাসছে বুলু।

রমেশ বলে,

শুধু একটা কাজ করতে হবে, খুব হুঁসিয়ার, ধরা পড়লে সব ভেস্তে যাবে। মায় চোটও হয়ে যাবি।

বুলু বলে, ওসব ছাড়ো রমেশদা, এ মাল খুন করতে জন্মেছে। খুন হবে না সহজে। বল কি করতে হবে।

রমেশ ব্যাগ থেকে একতাড়া ইস্তাহার বের করে দেয়, আর

গহনার দোকানের লুট করা বাক্স, কিছু মালপত্র দিয়ে বলে, খুব সাবধানে গিয়ে যতীনবাবুর বাড়ির মধ্যে কোথাও চাপা-চুপি দিয়ে রেখে আসতে হবে! এখুনিই! আজ রাতেই লালুদের বাড়িতে রাখবি। বুলু বলে, তাচ্ছিল্যভরে—এই কাজ! ঠিক আছে! চল বে।

পিনু আরও একজনকে নিয়ে সে বের হয়ে গেল!

রাত্রি শেষ হতে দেরী নেই। ভোরের আকাশে দু'একটা তারা উজ্জ্বল হয়ে আছে। তখনও মহল্লার লোকের ঘুম ভাঙেনি।

হঠাৎ ঘুমন্ত কুকুরের দল এখান ওখানে জেগে উঠে চীৎকার করছে। দু'একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ওঠে। ভারি বুট-এর শব্দ মিশেছে তার সঙ্গে।

পাড়ার অনেকেই জেগে উঠেছে। চাপা স্বরে বলে পুলিশ! পুলিশ দলবল নিয়ে সারা এলাকা, ঘিরে ফেলেছে রাতের অন্ধকারে। তাদের অ্যাকশন শুরু হয়। বিজয়াদেবীর ঘুম ভেঙে গেছে পায়ের শব্দে। দেবেনবাবুও অবাক হন।

বিজয়া বলে, আবার কারা এলো বোধ হয়! রাতে কি শান্তিতে ঘুমোতেও পাবো না। দিনে-রাতে অশান্তি! কি যুগ এলো?

দেবেনবাবুও ভাবছেন কথাটা কাদের পায়ের শব্দ শোনা যায় অনেকবার।

সেই রাতেই বোমা বিস্ফোরণ, গুলির শব্দ আজও ভোলেনি তারা।

যেন তেমনি কোন দস্যুর দল আবার হানা দিয়েছে। সাবিত্রীও জেগে ওঠে। লালু কান পেতে আছে। সে জানে তেমন কিছু হলে খবর ঠিক আসবে। পটলা, গোবিন্দরা বাইরে পাহারায় থাকে।

কিন্তু তার আগেই কয়েকটা জোরালো আলো জ্বলে ওঠে।

পুলিশের বাঁশী বাজছে। ভারি কণ্ঠে কে বলে,—দরজা খুলুন। পুলিশ! আমরা ভিতরে আসব।

বিজয়া উঠে গেল ওদের দরজা ধাক্কার চোটে। না খুললে জীর্ণ দরজাটাকে ভেঙেই ফেলবে তারা। সাবিত্রী ভীত চকিত চাহনিতে চেয়ে আছে।

দরজা খোলা পেয়ে রাইফেল, পিস্তল বাগিয়ে ধরে পুলিশ-এর দল ঢুকে পড়েছে। লালু উঠে বের হয়ে আসতেই একজন ওর সামনে রিভলবার তুলে বলে, নড়লেই গুলি করব। অ্যারেষ্ট!

একজন এগিয়ে এসে হাতকড়া লাগায় ওর হাতে। লালু বিস্মিতস্বরে শুধোয়, আমি কি করেছি?

অফিসার ধমক দেয়, চোপ! কি করেছ সব খবর তুমিই বলবে! থানায় চলো।

দেবেনবাবু অসুস্থ শরীর নিয়েই বের হয়ে আসেন। লালুর হাতে হাতকড়া দেখে বলেন,

কি করেছে ও? কেন ওকে অ্যারেস্ট করছেন! না, ও কিছু করেনি।

– থামুন! পুলিশ অফিসার গর্জন করে, কি করেছে তা জানেন না? ওরা দেশদ্রোহী ডাকাত! বলে কিনা দেশ উদ্ধার করছি! দেখুন! তার নমুনা!

বাইরের বাড়ির ওদিকের ভেঙে পড়া চালা থেকে ওরা উদ্ধার করেছে কিছু লাল কাগজে ছাপা ইস্তাহার, যেটা কাল বাজারে লুঠ হবার পর পাওয়া গেছিল। কিছু গহনার দোকানের খালি বাক্সও।

লালু চীৎকার করে ওঠে, এসব মিছে কথা! আমি এসবের কিছুই জানি না। এসব এখানে কি করে এল?

দেবেনবাবুও আর্তনাদ করে ওঠেন, না! লালু এ কাজ করতে পারে না! এসব ষড়যন্ত্র।

সারা পাড়াকে বেড়াজালে ঘিরে ফেলেছে পুলিশ বাহিনী, প্লেন ড্রেসেও বেশকিছু লোক এসেছে।

ওদিকে যতীনবাবুর বাড়িতেও পাওয়া গেছে সেই ইস্তাহারের প্যাকেট, আর গহনার দোকানের কিছু বাক্স, গহনাও রয়েছে ছোট-খাটো দু'একটার মধ্যে।

নবীনবাবুর দোকানের টাকার থলেটায় কোম্পানীর নাম লেখা সেটাও পাওয়া যায় যতীনদের গোয়াল ঘরে।

সকালের আলো জাগার সঙ্গে সঙ্গে সারা এলাকার মানুষ জেগে গেছে। বাজার-এলাকা থেকে ছুটে এসেছে নবীববাবু, মা দুর্গা জুয়েলারী স্টোর্সের মালিক, অন্য দোকারদার বা আর প্রচুর কৌতুহলী জনতা। আজ এখানকার সব হাঙ্গামার নাটের গুরুদের পুলিশ হাতেনাতে ধরেছে। ওরা একসঙ্গেই অবাক হয়, এই দারুণ খবরে।

পাড়ার লোকজনও এসেছে অনেকে।

সামনের মাঠটার চারিদিকে ভিড় করেছে পুলিশের গাড়ি, ভ্যান পুলিশের দল। আর মাঠের মাঝে এনে হাজির করছে পাড়ার এ-গলি সে গলি, সে বাড়ি থেকে তরতাজা জোয়ান ছেলেদের। অনেকে কুঁকড়ে গেছে। এমন বিপদে তারা কখনও পড়েনি।

তাদের বাড়ির মা-বোনেরা ও অভিভাবকরা কান্নাকাটি করছে। অনুনয় বিনয় করছে। অনেকে চুপ করে গেছে ভয়ে।

এতদিন ধরে তারাও শুনে আসছে উগ্রপন্থী তরুণ কিছু ছেলেদের কথা। দেওয়ালে পোস্টারও দেখেছে, শুনেছে কলকাতা শহরে, সারা দেশে অন্য জায়গাতেও তারা প্রতিবাদের হিংস্র হাত মেলছে।

কিন্তু সেই সাংঘাতিক ছেলেগুলোর কিছু যে তাদেরই মধ্যে এভাবে শান্ত-নিরীহ রূপ ধরেছিল তা ভাবতে পারেনি। আরও

চমকে উঠেছে তারা—ওই দলের নেতা নাকি ওই যতীন রায়।

শান্ত ভদ্র শিক্ষিত তরুণ মার্জিত রুচির অধ্যাপক। এতদিন এই এলাকার মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়িয়েছে, হাসপাতাল করেছে কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে, শিক্ষার ব্যাপারেও অনেক কাজ করেছে সেই যতীন যে তলে তলে এমনি সাংঘাতিক তা ওরা বুঝতে পারেনি।

যতীনবাবুকে ধরে এনেছে পুলিশ। লালু, পটলা, গোবিন্দ তার দলের ছেলেদেরও অনেককে ধরছে।

এসে পড়েছে রমেশ সরকার। খবরটা সে আগেই পেয়েছিল। তার শেষ চালটা আজ দারুণ কাজে লেগেছে। সব শত্রুদেরই জালে ফেলেছে সে।

রমেশই এখন এই এলাকায় বিশিষ্ট কর্মী। সে বলে পুলিশ অফিসারদের—

এসব কাদের ধরেছেন? যতীনবাবু সৎ লোক। ওই লালুদের আমি চিনি। ওরা খেলাধুলো নিয়েই থাকে। এসব দলে ওরা নেই।

সকলেই এবার সেই কথাই জানাতে চায়।

এলাকার মানুষ, বৌ গিন্নীরাও বলে রমেশের কথার খেই ধরে। ওরা এসবে নেই! থাকতে পারে না। বরং বাইরের আক্রমণ থেকে, ওয়াগন ব্রেকারদের বোমাবাজি থেকে পাড়াকে বাঁচায়!

পুলিশ অফিসার বলে—

আমামাদের মাপ করবেন রমেশবাবু, আমাদের প্রমাণ রয়েছে। এসব মালও পেয়েছি ওদের বাড়ির গোপন ঠাঁই থেকে। ওরা এ ব্যাপারে জড়িত। এ সময় ওদের ছাড়া যাবে না। তবে যাদের তেমন দোষ নেই দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করেই ছেড়ে দেব। লালু দেখছে রমেশকে। এনিয়ে কোন অনুরোধ করবেন না, আমাদের

আইন মাফিক কাজ করতে দিন।

পুলিশের জবাবে মনে মনে দারুণ খুশি হয় রমেশ। তবু বলে—বোধহয় ভুল করছেন।

ওর কথাগুলোয় তার সারা গা জ্বলে ওঠে। ওর আশ্রয়েই ছিল সেই রাতে ওই যদুবাবুর হত্যাকারী বুলু পিনুর দল। যদুবাবুকে রমেশই শেষ করেছে নিজের পথ পরিষ্কার করার জন্য। এবার তাদের পালা। কারণ রমেশ জানে লালুর দল এখানে থাকতে তাদের ওই অন্ধকারের কাজগুলো বিনাবাধায় করা যাবে না।

পুলিশ অফিসার বলে, নিয়ে চল ওদের। এলাকায় গণ্ডগোল লুটতরাজ করা বের করছি।

লালু কঠিন স্বরে বলে যদুবাবুর খুনীদের ধরেছেন? ধরেননি! তারা আজও বহাল তবিয়ৎ-এ ঘুরছে। ওয়াগন ব্রেকার, তার মাল সামালদারদের সব খবর জানেন, অথচ তাদের ধরতেও পারেননি। আর সাজানো অপবাদের গন্ধ পেয়েই এসে সারা এলাকার ছেলেদের ধরে নিয়ে চলেছেন। এই আপনাদের বিচার?

একজন অফিসার ধমকে ওঠে, চুপ করো! হাতে-নাতে ডাকাতি করে ধরা পড়েছো, আবার কথা।

কয়েকটা ভ্যান বোঝাই করে ওরা চলে গেল। তখনও দাঁড়িয়ে আছে এলাকার স্তব্ধ মানুষ।

অনেক অসহায় অভিভাবক আজ রমেশকেই ধরেছে। কাতর স্বরে বলে, আমার ছেলে ওসবে নেই রমেশদা।

কেউ বলে—এবারের মত ছাড়িয়ে আনো আমার ছেলেকে।

সমবেত মানুষগুলো আজ তাকে আবার সেই প্রাধান্য দিতে এগিয়ে এসেছে।

রাতারাতি রমেশ এই এলাকার বিপন্ন মানুষের পাশে এসে তাদের সেবা করার সুযোগটা নিতে চায়।

বলে রমেশ, আমি নিজে থানায় যাচ্ছি। পাড়ার দু'একজন

এর মধ্যে রমেশের মন রাখার জন্য বলে, যতীনদা ওই লালুদের নিয়ে নানা কাণ্ড করত, চোখেও পড়েছে কিন্তু বলতে পারিনি ভয়ে।

একজন বলে, এবার তুমি বাঁচাও ভায়া।

রমেশ আজ হারানো আসন, প্রতিষ্ঠা ফিরে পেয়েছে। তাকে ঘিরে জনতার ভিড় জমেছে।

অসহায় দেবেনবাবুও লাঠিতে ভর দিয়ে এসেছিলেন মাঠে। আজ তাঁর সব সর্বকিছু হারিয়ে গেল। যদুপতিবাবু নেই, এতদিন ধরে পরিশ্রম করে স্কুল গড়েছেন, এলাকার বহু ছাত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠার কথা ভুলে গেছেন। আজ অপমানে, আঘাতে জর্জরিত হয়ে সেই স্কুল থেকে সরে এসেছেন।

জীর্ণ দেহ একমাত্র সন্তানকেও আজ চরম অপবাদ মাথায় নিয়ে পুলিশের হেপাজতে যেতে হয়েছে।

আজ পায়ের নীচে থেকে মাটিটুকু সরে যাচ্ছে তাঁর। সর্বকিছু হারিয়ে গেল। কোন সহায়, সম্বল কিছু নেই। এ সমাজকে তিনি দিয়েছেন অনেক, কিন্তু এই সমাজ তাঁর সর্বকিছু কেড়ে নিয়েছে।

—বাবা!

সাবিত্রীর ডাকে চাইলেন দেবেনবাবু।

বাড়ি চল বাবা!

দেবেনবাবু চাইলেন মেয়ের দিকে।

সকালের আলো আজ বিবর্ণ, কি যেন বেদনায় ম্লান। দেবেনবাবু লাঠিতে ভর দিয়ে জীর্ণ শরীর নিয়ে ফিরছেন।

ঘরে ফেরার পথটা অনেক, অনেক বেদনায় ভরা। সেই পথের যেন শেষ নেই।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে রমেশ—যেন অন্ধকারের এক জীব।

সাবিত্রী চাইল না ওর দিকে। বাবাকে নিয়ে চলেছে সে।

—+—